

४७३८

८०४ व
१०

४.६
२५

हलदौर (विजनौर) निवासी द्वारा पुस्तकालय गुरुकुल
कांगड़ी विश्वविद्यालय को सवा दो हजार पुस्तकें संप्रेम भेंट ।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
पुस्तकालय



विषय संख्या

पुस्तक संख्या

आगत पञ्जिका संख्या

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां

लगाना वर्जित है । कृपया १५ दिन से अधिक
समय तक पुस्तक अपने पास न रखें ।

डार

२२

निशानियां
५ दिन से
नहीं रख
लेये पुनः

32,284

23-5-80

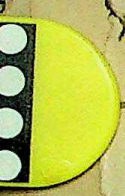
51-5

सक. प्रमाणीकरण ११-४-११-४४

সম্মেলন কথ্য



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



পথের কথা

Lo

Kh.

Alep nali

ব্রজ কাহিনী

Ramasa

Jo

famur

Tangail

Tan

শ্রীকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গোপীনাথ

মল্লিকার্জুন (মল্লিকার্জুন) লক্ষ্মী

কমলচন্দ্র সত্যশচন্দ্র দে

কমলচন্দ্র সত্যশচন্দ্র দে

সত্যশচন্দ্র দে

মল্লিকার্জুন

গোপীনাথ

লক্ষ্মী

সত্যশচন্দ্র

গোপীনাথ

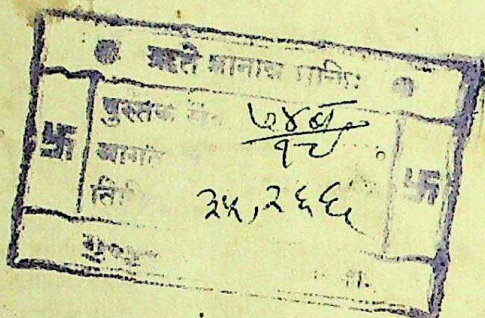
লক্ষ্মী

লক্ষ্মী

প্রকাশক ;

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

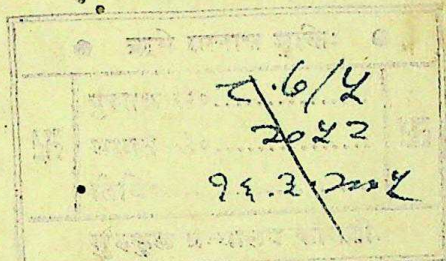
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী- ২০১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট ।



কলিকাতা ;

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে,

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ।



রাসবিহারি,

তুমি দেশ দেখিতে বড় ভালবাস। তাই আজ
তোমাকে কতকগুলি দেশের সংবাদ দিলাম—আশা
করি পড়িয়া খুসী হইবে। ‘পথের কথা’ হইলেও
তোমার কাছে ঘরের কথা অপেক্ষা বেশি ভাল
লাগিবে।

কলিকাতা
১৫ই ভাদ্র, ১৩১৮ }

তোমার বাবা।

কলিকাতা
১৫ই ভাদ্র, ১৩১৮

৩. ভূমিকা।

দেশে এত লোক থাকিতে শ্রীযুক্ত ফকিরবাবু আমাকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার “পথের কথা”র ভূমিকা আমাকে লিখিয়া দিতে হইবে। আমি না ভাবিয়া, না বুঝিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। এখন কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছি, কিন্তু কি লিখিব ভাবিয়া পাইতেছি না।

শ্রীযুক্ত ফকিরবাবুর পরিচয় প্রদানই কি ভূমিকা লিখিবার উদ্দেশ্য? তাহা হইলে সে প্রয়োজন ত ইতঃপূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার ‘ঘরের কথা’ অনেকেই পড়িয়াছেন, অনেকেই প্রশংসাও করিয়াছেন; সুতরাং সাহিত্য-ক্ষেত্রে যিনি এতদূর পরিচিত, তাঁহার আবার নূতন করিয়া কি পরিচয় দিব? তারপর ফকিরবাবু এই যে ‘পথের কথা’ লিখিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা পূর্বেই সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব ‘পথের কথা’ও পরিচয় অনাবশ্যক।

‘পথের কথা’ পরিচয় অনাবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু পথের পরিচয়ের আবশ্যক আছে। পথে সকলেই চলে, পৃথিবীতে এমন কে আছে যে একদিনও পথে চলে নাই? পৃথিবীতে আসিলে পথে চলিতেই হইবে; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সকলকেই পথে নামিতে হইবে। যে এই সংসার-পথে ‘পথের কথা’ জানিয়া নামে সে সুপথে চলিয়া যায়, আর যে ‘পথের কথা’ না জানিয়া আমার মত নামিয়া পড়ে, সে একপথে সাতবার যায়; অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যে দিকে ছুই চক্ষু যায় সেই দিকে চলিয়া যায়।

তাহার দীর্ঘ ভ্রমণ বুঝা হয়। এই জন্তই পথের পরিচয়ের আবশ্যক আছে।

আমাদের ফকিরবাবুর এই পুস্তকে পথের কথা আছে—সুপথেরই কথা আছে; তাই অনেকে বিশেষ আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া থাকেন। ছেলেবেলায় একখানি ইংরাজী পুস্তকে একটা গল্প পড়িয়াছিলাম, তাহার নাম “Eyes and No-eyes”। তখন গল্পটা সোজাসুজি পড়িয়াছিলাম; এখন ভাবিয়া দেখিতেছি কথাটা ভারি সত্য। চক্ষু থাকিলেই হয় না—দেখিবার মত হৃদয় চাই, দেখিবার মত শিক্ষা চাই, দেখিবার মত সাধনা চাই। ফকিরবাবুর তাহা আছে। তাই তাঁহার পথের কথা লোকে এত আগ্রহসহকারে শুনিয়া থাকেন। আমিও এককালে পথিক ছিলাম, কিন্তু দেখিতে পারি নাই। আমি কুরুক্ষেত্রের মাঠ ঘুরিয়া শুণু বনজঙ্গল দেখিয়াছি এবং ক্লান্ত হইয়া ‘লোটাস্তর’ জল খাইয়াছি; আর ফকিরবাবু রেলগাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া কুরুক্ষেত্রের দূরবিস্তৃত প্রান্তর দেখিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন; তিনি তাঁহার নয়নসম্মুখে গাণ্ডীবধারী অৰ্জুনকে দেখিয়াছিলেন, মহাবীর ভীমসেনকে দেখিয়াছিলেন, নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, আর কুরু-পাণ্ডবের সমরসজ্জা দেখিয়াছিলেন। ইহারই নাম দেখা। এমন করিয়া দেখিতে জানেন বলিয়াই ফকিরবাবুর বর্ণনা পড়িয়া লোকে আনন্দ লাভ করে।

কেহ কেহ বলেন, ফকিরবাবুর ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণনার কিঞ্চিৎ বাহুল্য দৃষ্ট হয়। আমি তাহাদের সহিত এক মত হইতে পারিলাম না। ‘হাবড়ায় গাড়ীতে চড়িলাম, সমস্ত রাত্রি পরে প্রাতঃকালে

মোকামায় নামিলাম,' ইহা ভ্রমণ বটে,—ভ্রমণবৃত্তান্ত নহে। রাস্তায় বর্দ্ধমান ষ্টেশনে যে সুন্দর সীতাভোগ খাইয়াছিলাম, গাড়ীর মধ্যে একজন তামাকখোর^০ যে কলিকার আগুন ছড়াইয়া ফেলিয়া লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজন করিয়াছিল, ইত্যাদি, যদি না বলিলাম, তবে আর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইল কৈ ? সে যে ভূগোলবিবরণ হইল।

ফকিরবাবু একটী ভুল করিয়াছেন। তিনি যদি 'ঘরের কথা' পর 'পরের কথা' লিখিয়া তাহার পর 'পথের কথা' অবশেষে 'পারের কথা' লিখিতেন তাহা হইলে বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা পাইত। ঘর ছাড়িয়াই 'পথে' নামিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই। এ ভ্রম আর সংশোধিত হইবার নহে। ফকিরবাবু 'পথের' খোঁজ পাইয়াছেন, 'পথের' সঙ্গী পাইয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা ফকিরবাবুর 'পথের কথা' পড়িয়া লোকে যেন পথের সন্ধান পায়।

শ্রীজনধর সেন।

সূচী

বিষয়						পৃষ্ঠা
দেওঘর ও তপোবন	...	...	...	...	...	১
এটোয়া	...	...	...	...	...	১৫
কালুকা পথে	...	...	...	...	...	২৫
বালেশ্বরে আট দিন	...	...	...	...	...	৫৭
খুরদা	...	...	...	...	...	৭২
চক্রধরপুর	...	...	...	...	...	৮৬

পুথের কথা ।

দেওঘর—তপোবন ।

তখন ইস্কুলে পড়ি। সংসারের কোনো সংবাদই রাখি না। বাবা জলখাবারের পরসা দেন, আমি বাঁচাইয়া ঘুড়ি-লাটাই কিনি। ইস্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে, পথে দাঁড়াইয়া ট্রামগাড়ির অবাধ্য অশ্বের দুরন্তপনা হাঁ করিয়া দেখি। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে অযথা বিলম্বের হেতু অন্বেষণ করিয়া মা কত বুকান। ঠিক সেই অবস্থায় আমাদের পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনীর একদিন সকালবেলা, একখানি সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ির মাথায় বিছানা-পত্র বোঝাই দিতে-ছিলেন। তাহাদের মধ্যে আমার একজন বাল্যবন্ধু। সে, সাহেব সাজিয়া খুব ব্যস্ততার সহিত একবার গাড়ির ভিতর উঠিতেছিল। পরক্ষণেই নামিয়া অকারণে বাড়ীর অভ্যন্তরে যাইয়া তখনই ছেঁড়া খাতা হাতে পুনরায় ঘুরিয়া আসিতেছিল। আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতেই সে সহস্রাঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল তাহার গ্রীষ্মাবকাশে “দেওঘর” বেড়াইতে যাইতেছে। তারপর সে নিজেই দেওঘরের অপূর্ণ সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে লাগিল। সেখানে কেমন পাহাড় আছে। পাহাড়ের উপর কত রকম গাছ—সে সব গাছে, আবার কত প্রকার ফল হইয়া রহিয়াছে; যাহার খুসী সেই পাড়িতে পারে, কেহ মানা করে না। তাহাদের বাড়ীর নিকটেই নদী। সে ছুপুর-বেলা সেই নদীর ধারে ধারে খেলা করিয়া বেড়ায়। নদীতে হাঁটুজলও নাই। তাহার কিছুমাত্র ভয় করে না। তাহাদের বাড়ীতে বসিয়া

ত্রিকূট পাহাড় দেখা যায়। সে কেমন সুন্দর! আকাশের গায়ে যেন আঁকা ছবি। সেখানকার পথগুলি কেমন ঢেউখেলান। সে একদিন ঘুড়ি উড়াইয়া পাহাড়ে ঠেকাইয়া দিয়াছিল। আমি অবাক হইয়া তাহার কথা শুনিলাম। শুনিতে শুনিতে সেই অজ্ঞাত দর্শনের জন্ত কেমন একটা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই নিস্তরু নির্জন পাহাড়ের বক্ষে ফলভারাবনত তরুচ্ছায় বসিবার বাসনা আমাকে উদ্ভাস্ত করিয়া তুলিল। নদী-সৈকতে, বাড়ীর মত, ‘খেরাকাটি’ দিয়া বহুদূর বিস্তৃত রেল-লাইন পাতিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। আমার অনেকগুলি স্মৃতির ‘কাটিম’ সঞ্চিত ছিল; সে গুলির সমষ্টিতে যে একখানি বড় রেলগাড়ি সৃজন করিতে পারিব ইহা ভাবিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম। বন্ধু হাসিতে হাসিতে “দেওঘর” চলিয়া গেল। আমি বাড়ী ফিরিয়া গিয়া মার কণ্ঠ জড়াইয়া বলিলাম,—“মা, আমি দেওঘর যাব।” মা বলিলেন “বড় হও, তার পর তখন যাবে।” মার কথার প্রতিবাদ করিয়া উত্তর করিলাম,—“ও ত বড় হয় নাই, ও কেন গেল?” “ওঁরা বড়লোক, ওঁরা পারেন।” মার সেই সজল নয়ন ও স্নেহ-করণ ছবি আজও আমার প্রাণে অঙ্কিত রহিয়াছে। আজ তিনি কোথায়! আজ যে তাঁর আশীর্বাদবানী পরিপূর্ণ হইয়াছে। পশ্চিমে বেড়াইতে আসিয়া যখন প্রকৃতির সুসমা, সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়ি, যখন নদীর লীলাতরঙ্গে, সুনীল নভোমণ্ডলে সুবর্ণমেঘের আনাগোনা দেখি, যখন পাহাড়ের কণ্ঠ বেড়িয়া ঘনকৃষ্ণমেঘরাজি পাহাড়ের শিরঃ চুষ্মন করে ও সোনার আলোক-হাসিতে বিশ্ব চমকিত করিয়া তোলে, তখন মনে হয়—মা, আজ তুমি কোথায়? ঐ যে মেঘের মধ্যে সুবর্ণের দীপ্তি, ও কি তোমার আনন্দহাসি? ঐ যে নদীসলিলে লীলাতরঙ্গ, ও কি

তোমারি করুণাবতী ? ঐ যে পাহাড়ের বক্ষে নিৰ্ঝরির মোহনমেলা,
ও কি তোমারি স্তম্ভপীযুষধাঙ্গী ? তাহা না হইলে এত সৌন্দর্য্য কার ?

এখন বড় হইয়াছি। জীবনের বাল্যঅংশটুকু যৌবন হইতে
বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি বাল্যের সকল সংস্কার
যে একবারে মুছিয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। বাল্যের এক
একটি বাসনারেখা হৃদয়ের পর একরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে
যে তাহা কোনো দিন বিলুপ্ত হইবে এমন কল্পনাও মনে উদয় হয় না ;
নানা দিক হইতে অজ্ঞাত অসংখ্য আকাক্ষা ও আশঙ্কা আসিয়া
জীবনকে যেমন কর্ণময় করিয়াছে, তেমন অশান্তিময় যে না করিয়াছে
তাহাও নয়।

সে আজ অনেক দিনের কথা হইলেও, স্মৃতি-মন্দিরে সে কথা, সে
দৃশ্য, সে আনন্দ-উল্লাস দরিদ্রের ধনরত্নরাজির তায় যত্নে সঞ্চিত
হইয়া আছে। বাল্যে যাহা অধুরিত হইয়াছিল, যৌবনে জননীর
আশীর্বাদের শান্তিবারিতে তাহা মুকুলিত হইল। যৌবনের প্রারম্ভে
তেমনই একদিন সকালে, আমার বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন দেওঘর
যাত্রা করিলাম।

গাড়িতে আরোহণ করিয়া কি আনন্দ ! কি এক অনির্বচনীয় সুখ !
তাহা যে সহজে কল্পনা করা যায় না। গাড়িতে উঠিয়া অবধি যেন
কোনো কিছুই দেখিতে ভাল লাগিতেছিল না। তার পর বাঙ্গালার
শ্রাঘল সমতল ক্ষেত্র হইতে যখন ক্রমে ক্রমে পর্বতময় দেশের ভিতর
দিয়া গাড়ি চলিতে লাগিল—যখন ছোট বড় পাহাড়গুলি মেঘ বলিয়া
ভ্রম হইতেছিল, তখন যেন একটা আকাক্ষা, একটা অনাস্বাদিত দর্শন-
সুখের আনন্দবার্তা বহিয়া আনিতেছিল। মনে হইতেছিল, কতক্ষণে
সেই কল্পনায় গড়া, স্বপ্নে অঙ্কিত, শত সাজে সুসজ্জিত সুন্দর দেওঘরে

গিয়া উপস্থিত হইব ; কতক্ষণে গিয়া নদীবক্ষে বাঁপাইয়া পড়িব, কতক্ষণে গিয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইব । আমার আশা শীঘ্রই পূর্ণ হইল । দেওঘরে উপস্থিত হইলাম । তখন প্রভাতের মুহূর্ত্তে স্নিগ্ধ বাতাস আসিয়া যেন সাদরসম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিল । পরিপূর্ণ প্রকৃতি যেন, তার সুস্বাসস্তারে সর্বদিক্ হইতে আমাকে আচ্ছন্ন ও আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল ।

দেওঘর ।—পথেই কয়জন পাণ্ডা আসিয়া সহসা ওয়ারেন্টের আসামীর ছায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাতাপত্র লইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিল । পিতৃপুরুষের নাম ধাম—নানাবিধ ছায়, অছায় প্রভে উদ্ভাস্ত করিয়া তুলিল । বহুর অকস্মাৎ আগমনের ছায় আমার কল্পনা সেই শব্দবছায় ভাসিয়া যাইতেছিল । উপায়ান্তর না দেখিয়া নিমজ্জমান ব্যক্তির ছায় তাহাদের একজনকে অবলম্বন করিয়া বাবা বৈষ্ণনাথের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইলাম । দেওঘর সম্বন্ধে অনেক বলিবার থাকিলেও সে সকল বহুবর্ণিত বর্ণনাগুলির পুনরুক্তি এ স্থলে নিম্প্রয়োজন ।

বৈষ্ণনাথ দর্শন করিয়া, তাঁহার পূজা প্রদান করিয়া—নন্দন পাহাড়ে আরোহণ করিয়া ডিগোরিয়া দেখিয়া, নদী-সৈকতে বালুকার স্তূপ নির্মাণ করিয়া যে কি এক আনন্দ অনুভব করিলাম তাহা বলিতে পারি না । মানুষ যতই কেন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, বয়স প্রাপ্ত হন না প্রকৃতির কোলে, শ্রামল তরুচ্ছায়ায়, সে যেন আনন্দজ্বলাল ! শিশুর ছায় কোমল, মুক্ত ! উদার ! আমরা যে সময় দেওঘর গিয়াছিলাম সেই সময় গিধড়ের মহারাজা সপরিবারে দেবদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন ; দেওঘর তখন ভক্তের আনন্দকোলাহলে তরঙ্গায়িত হইতেছিল । দেওঘর হইতে গিধড় প্রায় ৩৪ মাইল দূর । কিন্তু, ভক্ত

রাজা সহস্র সুখসমৃদ্ধির সুশীতল ছায়ায় বর্দ্ধিত হইলেও শুনিলাম তিনি বৈষ্ণবনাথের আরাধনা করিতে গিধড় হইতে পদব্রজে আগমন করিয়াছেন। পাছে রেলের আসিলে পূজা-উপচার শ্রদ্ধার সংস্পর্শে অপবিত্র হয়, পাছে তাঁহার উপাসনায় অশান্তি উপদ্রব উপস্থিত হয়, পাছে রাজ-ঐশ্বর্যের মোহ মনে অহঙ্কার আনয়ন করে, তাই তিনি সাধুর মত, সন্ন্যাসীর মত, পর্যটকের মত দেবপূজার সম্ভার নিজে স্বহস্তে বহিয়া আনিয়াছেন। এমন না হইলে ভক্তি, এমন না হইলে পূজা, এমন না হইলে কি আর হিন্দুরাজা!

হাঁসপাতালের সম্মুখেই আমরা বাসা লইয়াছিলাম। এই স্থানটি বেশ মনোরম। এইখান হইতে তিন দিকে তিনটি রাস্তা গিয়াছে। একটি দেওঘর স্টেশন অভিমুখে, অপরটি বৈদ্যনাথ জংসনের দিকে, অতুটি 'নয়াছমকারোড' বাবার মন্দির দিকে, স্মৃতরাং সকল যাত্রীর গমনাগমন বাসায় বসিয়া বসিয়া বেশ দেখা যায়। সময় সময় অনেক পরিচিত মুখের সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ ঘটিয়া যাইত, তখন এক অনাস্বাদিত আনন্দের আবেগে হৃদয় ভরিয়া উঠিত। আবার যখন দেখিতাম, কোনো নবাগত পল্লীবাসী নবদম্পতির সম্মুখে পাণ্ডুরা খাতাপত্র লইয়া বিবম গোল বাধাইয়াছে, আর পশ্চাতে সাত আটটি ভিক্ষুক বাজ্ঞন্দার তুমুল আন্দোলন করিয়া ঢোলে অধিচ্ছিন্ন ভাবে কাটা পিটিতেছে,—আর বলিতেছে, “তোমার মত পুণ্যবতী সতী সাধবীর বড়ই পুণ্য, যে বাবা বৈষ্ণবনাথের দর্শন পেলি, দে মায়া, একটা পয়সা দে।” আবার ও দিকে পাণ্ডুরা ইতিহাসের পড়ার মত অনূর্গল বংশলতার তালিকা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে, আর বলিতেছে,—“মিথ্যে বলিস্ নি, দেবতার স্থানে পাপ করিস্ নি, ভাল ক’রে মনে ক’রে দেখ্, আমি তোমার পাণ্ডা কি না?” তখন সেই সব নবাগত যাত্রীর দশা

নিরীক্ষণ করিয়া যেমন দুঃখ হইত, তেমনি হাসিও পাইত—একটি পয়সার জন্য বাজন্দারের অসীম অধ্যবসায়—বিপুল পরিশ্রম !

তপোবন ।—এখানে থাকিতে থাকিতেই একদিন আমরা তপোবন দেখিতে যাত্রা করিলাম । কথিত আছে, সেখানে স্বয়ং ব্রহ্মা তপশ্চরণ করিয়াছিলেন । যে গোপ-নন্দনের নিকট আমরা দুধ লইতাম তাহার বাড়ী তপোবনের নিকটেই । কোনো কোনো দিন দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া, সে আসিয়া আমাদের নিকট নানা গল্প বলিতে সুরু করিত ; শেষে যখন বেলা বাড়িয়া উঠিত, তখন আর তার সেবেলা বাড়ী ফেরা সম্ভব হইত না । আমাদের সহিত মধ্যাহ্নের আহারটি সুসম্পন্ন করিত ।

যাঁহারা তপোবন দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের প্রাতঃকালেই গরুর গাড়িতে রন্ধন উপযোগী দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া বাহির হইতে হয় ; কারণ ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়ে । “সেখানেই রন্ধনাদি করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিতে হয় ।

সেই গোয়ালার ছেলেটিকে আমাদের পথিপ্ৰদর্শকের পদে অভিষেক করিয়া বেলা আন্দাজ দুইটার সময় আমরা তপোবন উদ্দেশে পদব্রজে যাত্রা করিলাম । এই গয়লার ছেলেটির নাম “বিকুয়া,” বয়স ১৪।১৫ বৎসর । সহরের সংস্পর্শে আসিয়া ও বান্ধালী বাবুদের কোঁতুক কথোপকথনে অংশীদার হওয়ায় তার গায়ে অনেকটা আধুনিক সভ্যতার হাওয়া লাগিয়াছে । সে বয়স-তিরিক্ত অভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে । দুনিয়ার অনেক কথা তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় । তপোবন যাইবার পথটি বড়ই চিত্তাকর্ষক । দূরে ত্রিকূট পাহাড়, আকাশ পাহাড়ের উপর ঝুকিয়া কি পরামর্শ করিতেছে । মনে হইল আর অল্পদূর অগ্রসর হইলেই তাহার

নিকটবর্তী হইব ; কিন্তু যতই যাইতেছি ত্রিকূট যেন ততই সরিয়া যাইতেছে। আমরা আগ্রহ ও উৎসাহভরে খুব চলিতে লাগিলাম। আমাদের কথোপকথনেও রসালোপে সেই বন্ধুর পথ যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অগ্রে অগ্রে গোপ-নন্দন চলিয়াছে ; আমরা যেন অন্ধের মত, তাহার অনুসরণ করিতেছি,—“বিকুরা” মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া পড়িতেছে, মুখ খুব গম্ভীর করিয়া বলিতেছে “এ পথ নয়, পথ ভুল হয়েছে ; চলুন ফিরে যেতে হবে। তপোবনের রাস্তা পথে ফেলে এসেছি।” অগত্যা আমরা আবার ফিরিলাম। অল্পদূর আসিয়া সে হাসিয়া উঠিল—তার এই উচ্ছৃঙ্খল হাস্যধ্বনি বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে দূর দূরান্তরে চলিয়া গেল। অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইলাম। সে কহিল,—“না, ঐ রাস্তাই ঠিক,” তার এই আচরণে যেমন রাগিয়া উঠিলাম, সে ছুটিয়া একটা উচ্চ পাষণ্ডত্বের উর্দ্ধে উঠিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল ; বলিল,—“আমি পথ জানি না, যেতে পার্ব না।” তখন সেই ছরম্বত বালকটিকে অনুনয় বিনয় করিয়া বক্শিসের মাত্রা সম্ভবতঃ বৃদ্ধি করিয়া বশতা স্বীকার করান হইল। এইবার কৌশলে তাহাকে দলের মাঝখানে সন্নিবেশিত করা হইল। উপেনবাবু সর্বাঙ্গে চলিলেন, পশ্চাতে রহিলেন সুবোধবাবু—পাছে সে পুনরায় পলায়। দুই ঘণ্টা পথ চলিয়া আমরা শান্ত হইয়া পড়িলাম। রাস্তাটি উঁচু নীচু, মাঝে মাঝে বড় টিপির মত অনেকগুলি পাহাড় অতিক্রম করিতে হইল। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণাগুলি রৌদ্রকিরণে রূপার পাতের মত চক্‌মক্‌ করিতেছে। সেইগুলির নিকট উপস্থিত হইলেই অঞ্জলি ভরিয়া স্নিগ্ধ বারি সেবন করা হইতেছিল।

এইবার যে স্থানটায় আসিয়া পৌঁছিলাম সেখানটা বড়ই মনোরম—পথের মাঝে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় এবং সেই পাহাড়ের মধ্যে পথটি

ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, পথ নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। এই পাহাড়টি একেবারে মরুময়—একটিমাত্র বৃক্ষলতা পরিদৃষ্ট হয় না; রৌদ্রদগ্ধ নির্মম কঠিন পাষাণস্তূপ যেন পদিককে পরিহাসচ্ছলে পথ ভুলাইবার নিমিত্ত পড়িয়া আছে। তাহার উপর উঠিলে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়—দেওঘরের বড় বড় বাড়ীগুলি যেন মনে হয় ভূ-কম্পনে মৃত্তিকার গর্ভে বসিয়া গিয়াছে। এই স্থানটির নাম বিকুয়া বলিল “চরকি-পাহাড়ী”। আমাদের মনে হইল এখানে আসিয়া যে রূপ পথ খুঁজিতে হয়, তাহাতে ইহার নামকরণে অল্পমাত্র অত্যাচার হয় নাই। চরকি-পাহাড়ীর উপর আসিয়া বিকুয়া ব্যাটা যেন চরকীর মত ঘুরিতে লাগিল। তাহার স্ফুর্তি দেখিয়া ত হাসিয়া বাঁচি না। চতুর্দিকে অনন্ত বিস্তৃত শ্রামলশস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে দুই একখানি অতি ক্ষুদ্র কুটার, দুই একটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তালবৃক্ষ। সেগুলি যেন চিত্রার্পিতের স্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অদূরে ত্রিকূট মাথা উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া। তাহারই দক্ষিণে—তরুচ্ছায়াশ্রামল তপোবনের কমনীয় দৃশ্যাবলী অল্প অল্প নয়নগোচর হইতে লাগিল। সে দৃশ্যে প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল। এই সময় বিকুয়া বলিল,—“বাবু, ঐ তপোবন! আপনারা এই রাস্তা ধরে বরাবর যান, তা হ’লেই তপোবনে গিয়া উঠবেন।” তার ছুঁটামি বুঝিতে বড় বেশীক্ষণ লাগিল না, সে আরও কিছু পয়সা বেশী চায়। আমরা বলিলাম,—“যদি তুই তপোবন পর্য্যন্ত যাস তবে তোকে আর দু-আনা বেশী দিব, নতুবা এক পয়সা পাবি না।”

তখন পশ্চিম দিগন্তে দিনদেব সূর্য্য তরঙ্গোচ্ছ্বাসে অবগাহন করিতেছেন। শৈলশিখরের উপর অন্তর্মিত সূর্য্যকিরণে প্রকৃতির মিলন হাসির ক্ষীণোজ্জ্বল রক্তিম আভাটুকু, ঘুমন্ত শিশুর হাসির মত, বড় স্নিগ্ধ ও পবিত্র দেখাইতেছিল—দূর হইতে মুক্ত প্রান্তরের বক্ষে নির্মল অনিল

প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। শীঘ্র সন্ধ্যা হইবে ভাবিয়া আমরা খুব তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলাম। উপেন্দ্রবাবু রাগিয়া বিকুয়াকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সে আবার শান্তমूर्তি ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। যখন তপোবনের খুব নিকট-বর্তী হইলাম, তখন বিকুয়াকে বলা হইল,—“কই, তোর বাড়ী কই?” সে প্রথমে কোনো মতে তার বাড়ী দেখাইতে স্বীকৃত হইল না, অবশেষে অনেক ভয়প্রদর্শন ও পীড়াপীড়ির পরে একটি বড় মোউল বৃক্ষের নিম্নে তালপাতা সমাচ্ছাদিত একখানি পর্ণকুটীর দেখাইয়া বলিল,—“ঐ আমাদের বাড়ী”। কুটীরের চতুর্দিকে কাঁটা-গাছের বেড়া, উঠানের এক পার্শ্বে একটি আতা গাছ। অগ্ন্য দিকে দুইটি বড় বড় পেঁপে গাছ, তাহাতে পত্র অপেক্ষা ফল ও ফুলের সংখ্যা বেশী। আমরা সদলে তাহাদের সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণে গিয়া অতিথি হইলাম। অকস্মাৎ বিকুয়ার যেন অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল,—সে বলিল, “মা, বাবুরা এসেছেন, তপোবন দেখবেন।” তারপর যাহা কিছু কর্তব্য সব যেন তার মা জানে। সে কেমন করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিবে, কেমন করিয়া বা কোথায় আমাদের বসাইবে, এমনতর তাহাদের আর কখনও হয় নাই। তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরপ্রাঙ্গণ ত এত ভদ্র-লোকের সমাগমে কোনদিন মুখরিত হয় নাই। তাহাদের কুটীর-খানি, উঠানে বাঁধা দুইটি ছাণ্ডল, তাহার বৃদ্ধ পিতা—সব যেন স্তব্ধ ও নির্ঝাক হইয়া গেল। পাশের ঘর হইতে কাহার যন্ত্রণাকাতরধ্বনি যুহু যুহু শ্রুত হইতেছিল। বিকুয়ার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। বুড়া যেন সংসারের দারুণ নিষ্পীড়নে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এখন আর দুধ লইয়া দেওঘর যাইতে পারে না। বিকুয়াই তাহাদের একমাত্র অন্ধের-যষ্টি, তাহাকে দেওঘরে পাঠাইয়া এই বুড়াবুড়ী একদৃষ্টে পথপানে তাকাইয়া

থাকে। বিকুয়ার জননী পাশের ঘর হইতে একখানি 'চেটাই' টানিয়া বাহির করিলেন। মনে হইল এই দরিদ্র-সংসারে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাই আজ আমাদের অর্থার্থনার জন্ত বাহির হইল। সে খানি বিশেষ ব্যবহৃত বলিয়া অনুমিত হইল না। 'ঘরের দাওয়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সুতরাং সেই আতাবুকের পাদদেশে চেটাইখানি বিস্তৃত করা হইল। আমরা আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাহার উপর উপবেশন করিলাম।

যেন পুণ্যাশ্রমের পবিত্র প্রাঙ্গনে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি। বৃদ্ধ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন বলিতেছিল,—“আদেশ করুন, কি করিয়া আপনাদের তৃপ্তিসাধন করিতে পারি।” বিকুয়ার সকল চাঞ্চল্য তখন সংযত; সে চেটাইয়ের একপার্শ্বে গিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধা যেন, কি বলিবেন বলিবেন, মনে করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। তিনি একবার স্বামীর মুখের প্রতি, একবার পুত্রের আননের দিকে কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার মুখের উপর বেশ একটি আনন্দরাগ বিরাজ করিতেছে। এই সময় উপেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি একটা অর্ধনগ্ন বালকের প্রতি পতিত হইল। তিনি তাহাকে সাদরে নিকটে আহ্বান করিলেন। বালক ভয়চকিতদৃষ্টিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় মস্তক নত করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল, একপদও অগ্রসর হইল না। তখন বিকুয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—“ও আমার ছোট ভাই, ভোঁয়িল চরাতে গিয়াছিল।” তার পর ছুটিয়া গিয়া ভ্রাতার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহের দিকে টানিয়া আনিতে লাগিল ও তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল,—“ওঁরা বাবু, ভয় নেই আয়।” উপেন্দ্র বাবু তখন উঠিয়া গিয়া বালকের গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইয়া আদর করিলেন।

বালক বলিল,—“ভোঁয়িস ও গাই ঐ গাছতলায় রেখে এসেছি।”
 বালকের বয়স নয় বৎসরের অধিক নয়। কিন্তু তার হাতে একগাছি
 চার হাত লম্বা লাঠি, পরিধানে কোঁপীন। তাহারই তত্ত্বাবধানে
 তিনটি মহিষ ও দুইটি গরু। এইবার সে অনেকটা সাহস পাইল।
 গরু মহিষ গোয়ালে তুলিল। তাহার কার্য ও শক্তি দেখিয়া আমরা
 অবাক হইয়া গেলাম। দূর হইতে আর অনেকগুলি বালকবালিকা
 সকৌতুকদৃষ্টিতে আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। তাহাদের
 দিকে চাহিবামাত্র তাহারা ছুটিয়া পলায়ন করিতেছিল। পথ হাঁটিয়া
 অত্যন্ত পিপাসা বোধ হইয়াছিল। জল চাইতেই যেন গৃহস্বামিনী বড়ই
 বিব্রত ও অধীর হইয়া পড়িলেন। এমন পাত্র নাই—যাহাতে করিয়া
 জল দিতে পারেন। এই সময় পার্শ্বের ঘর হইতে তাহার কণ্ঠা কাঁপিতে
 কাঁপিতে বাহিরে আসিল। অনুসন্ধানে জানিলাম সে আজ চারপাঁচ
 দিন জরে ভুগিতেছে। কিন্তু তাহাদের মতে ভূতের হাওয়া লাগিয়াছে,—
 “ঝাড়্ ফুঁক্” চলিতেছে। কিন্তু দ্রুত ভূত কোন মতেই বেচারীর
 সংসর্গ ত্যাগ করিতেছে না। আমরা মেয়েটিকে অচিরে ডাক্তার
 দেখাইতে অনুরোধ করিলাম। বৃদ্ধের স্নান অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা
 দেখা দিল। তিনি বলিলেন,—“মন্তোরে সেরে যাবে বাবু, আমরা কখন
 দাওয়াই খাই না।” এই অবসরে বৃদ্ধা বলিলেন,—“আমাদের ঘরের
 জল আপনাদের দিতে ভয় হয়, এ ত নদীর জল নয়। দুধ দেব কি?”

উপেন্ বাবু বলিলেন,—“দুধ পেলে কি আর জল চাই।” তখন বৃদ্ধা
 একটা বড় কেঁড়ে পরিপূর্ণ দুধ বাহির করিলেন, প্রায় পাঁচ সের দুধ;
 ঢালিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিলেন; আমরা আনন্দে দুধ খাইলাম। সেই
 তরুচ্ছায়িন্ধি—সেই নীরব নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্যে ক্ষুদ্র কুটার আজও
 আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। অদূরে বিকুয়া, পার্শ্বে তার

ছোট ভাই, অরুণিষ্ঠা ভগিনী, বৃদ্ধ পিতা নির্গিমেষ নয়নে আমাদের প্রতি তাকাইয়া ; সেই চাহনি হইতে এমন একটি মধুর ভাব প্রকাশ পাইতেছিল, যে তাহারা আজ যেন এমন একটি কাজের অনুষ্ঠান করিবার অবসর লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝি তাহারা কোনও দিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই । বৃন্দাবনের গোপগৃহের সকল সৌন্দর্য্যে আজ বৈষ্ণবনাথের কঙ্করময় ও বন্ধুর পথ, প্রান্তর এবং দীনদরিদ্রের পর্ণকুটীর, ভরিয়া উঠিল । উল্লাসে নয়নে জল আসিল । আমরা দুধের দাম দিতে উদ্যত হইলে, বিকুয়ার মা জিব্ কাটিয়া সঙ্কুচিত হইয়া অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিলেন,—“বাবু, মাপ্ করুন ; আমরা গরীব সত্য, কিন্তু অতিথিসেবা করা আমাদের ধর্ম্ম ।” তার পর জননী র স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন,—“এই বেলা বিকুয়া, বাবুদের নিয়ে যা ; নয়ত অন্ধকার হ’য়ে এল বড় কষ্ট হবে, বাঘের ভয় আছে ।” ছোট ছেলেটি এতক্ষণ বড় কথা কয় নাই, সে তার বড় যষ্টিগাছি নাড়িয়া বলিল,—“মাগি আনি যাব, ভয় কি ?”

বিকুয়াদের বাড়ী হইতে তপোবন পনের মিনিটের পথ । সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা তপোবনে উপস্থিত হইলাম । পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর মন্দির—অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উঠিতে হয় । নিয়ে একটি প্রকাণ্ড রকমের মঠ ; সেখানে অনেকগুলি সাধুবেশী লোক গঞ্জিকা প্রস্তুতে বিব্রত । কেহ কেহ মনকে নরম করিবার জন্ত বোধ হয় রুটীর আটার উপর দিয়া কসরৎ করিতেছে । বড় বড় আটার তালগুলিকে এমন ভাবে পেষণ করিতেছে যে, কপাল হইতে অজস্র স্বেদনির্গম হইতেছে । মাঝে মাঝে টিপিয়া দেখিতেছে কতটা নরম হইল । তাহারা আমাদের দিকে ঠাকুরের পূজা দিতে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল । গৃহে বসিয়া এমন শিকার খুব কম ছোটে ।

উপরে গিয়া একটি চাতালের উপর উপবেশন করিলাম। সেই চাতালের সম্মুখেই মন্দির ; তখন ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর দ্বারমুক্ত করিয়া একজন গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী বাহির হইলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আগ্রহভরে আমাদের বসিতে অনুরোধ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার সহিত বেশ আলাপ পরিচয় হইল। তিনি আমাদিগকে মন্দির অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। মন্দিরের মধ্যে একটি বেদী, বেদীর উপর একখানি সিংহাসন, সিংহাসনের উপর একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, একখানি জীর্ণ গৈরিকবসন, এক জোড়া খড়ম রহিয়াছে। তাহার উপর ফুলচন্দন দিয়া পূজা হইয়াছে। আশ্রমটির মধ্যে গিয়া বেশ একটি অনাবিল ভক্তির শ্রোতে হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গৃহের মধ্যস্থলে একটি গহ্বর ; উহার উপর হইতে কবাট বন্ধ রহিয়াছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, ঐটিই “ব্রহ্মার গুহা” ঐখানে তিনি তপস্বী করিতেন। স্বামীজির আসন ঐখানে বিদ্যমান আছে। গুহার অভ্যন্তরটি দেখিবার নিমিত্ত আমাদের কোতুল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। মনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেন, “আপনারা কষ্ট স্বীকার করিয়া নীচে যাইতে পারিবেন কি ? প্রথমটা কিন্তু অত্যন্ত অন্ধকার, কোথাও পাথর উঁচু নীচু হইয়া আছে।” আমরা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, তিনি উপর হইতে কবাট উন্মোচন করিলেন। তখন গাঢ় জমাট অন্ধকারময় গুহা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। একটি দেয়াশলাই জ্বালাইয়া তিনি গুহার পথটি আমাদের দেখাইয়া দিলেন। ভিতরে যাইবার খুব ছোট ছোট চার পাঁচটি সিঁড়ি আছে। তাহার ভিতরে আর একটি গুহা। সেই স্থানে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রে পা দুইটি প্রবেশ করাইয়া পরে পৃষ্ঠে ভর দিয়া

শুইয়া শুইয়া ধীরে ধীরে যাইতে হয়। এই প্রকার উপায়েই তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তারপর আমাদের আত্মহান করিলেন ; বলিলেন, “ভয় নাই, আসুন” ভিতর হইতে তাঁহার স্বর যেন গম্ গম্ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সকলেই গুহাভ্যন্তরে অবতরণ করিলাম। গহ্বরভ্যন্তর অপূর্ণ, বিস্তৃত,—কুড়িজন লোক একত্র অনায়াসে উপবেশন করিতে পারে। মস্তকের উপর পর্বত, পদতলে পর্বত, চতুর্দিকে পর্বতপ্রাচীর বেষ্টিত। এইরূপ স্থানে আর কখন আসি নাই। প্রথমটা অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। অন্ধকারের মধ্যেই যেন অন্ধকার তরল হইয়া আসিল। একটু একটু আলো ফুটিয়া উঠিল। তখন স্পষ্ট দেখা গেল গুহার একপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র বেদীর উপর একখানি মৃগচর্ম, মৃগচর্মের উপর একখানি শার্দূল চর্মে সাধকের আসন সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এমন নির্জন না হইলে কি সাধনার স্থান !

যেন গুহামধ্যে অতীতযুগের হোমধূম গন্ধ, পুষ্প চন্দন ধূপের মনোমোহকর সৌরভ এখনো ভরিয়া রহিয়াছে। বাহিরের কোনো শব্দ সেখানে প্রবেশ করে না। মানব শান্তি অন্বেষী হইয়া, শত সুখ সৌন্দর্য্য বিলাস বিভ্রম পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা যে কত সুন্দর, কত মনোহর, কত তৃপ্তিদায়ক, আজ এই গুহাভ্যন্তরে আসিয়া তাহা উপলব্ধ করিলাম। যাহাদিগকে আমরা অরণ্যবাসী, গুহাবাসী বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি, তাঁহাদের এই আনন্দ-আবাসস্থান দেখিয়া সে ভ্রম অচিরে বিদূরিত হইল। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় আমরা তপোবন হইতে আনন্দপূরিত অন্তরে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে আজ কতদিন হইয়া গেল, তথাপি তাহার কথা ভুলিতে পারি নাই।

নিবেদন

মাহার ভ্রমণকাহিনী পড়িতে পড়িতে হৃদয় আনন্দে, আগ্রহে ভরিয়া উঠিত আঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাকে সুহৃৎভাবে লাভ করিয়া যে নিজেকে কতটা ধন্য মনে করি, তাহা ব্যক্ত করিবার মত কথা আমার নাই। তারপর তিনি 'পথের কথার' ভূমিকা লিখিয়া আমাকে চিরদিনের জন্য অচ্ছেদ্য ঋণ-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সে ঋণ পরিশোধ করিবার মত ত শক্তি আমার নাই। সুতরাং সেজন্য তাঁহাকে ছুইটি মৌখিক ধন্যবাদ না দিয়া আমার অন্তরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলে অনেকটা তৃপ্তি অনুভব করি।

আমার আত্মীয় ও সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্তসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় 'পথের কথার' আগাগোড়া প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। সুবোধবাবু ও বঙ্গবাসীর সুযোগ্য সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু মহাশয়দিগের আগ্রহ ও যত্ন না থাকিলে বোধ হয় এত শীঘ্র 'পথের কথা' প্রকাশ করিতাম না। তাঁহাদের উভয়ের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। 'পথের কথা' সামান্য হইলেও আশা করি সুধী পাঠকগণের নিকট অনাদরের কথা হইবে না।

কলিকাতা

১৫ই জাদ ১৩১৮

শ্রীকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এটোয়া।

সে দিন বেশ মনে আছে—কন্সেসনের শেষ দিন। ষ্টেশনে অত্যন্ত ভিড়। বহুকষ্টে একখানি টিকিট কিনিয়া বিস্তর ঠেলাঠেলি ও উমেদারীর-পর পাঞ্জীবমеле একটু স্থান সংগ্রহ করিলাম। ভান্সা বাড়ীর ‘ঠেকার’ মত আরোহীরা চারিদিক হইতে যেন চাপিয়া রহিল। নড়িবার চড়িবার উপায় নাই। নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছিল; তথাপি মনে একটা অভূতপূর্ব আনন্দ লহর খেলিতেছিল। বর্ধমান অতিক্রম করিলেই ভিড় অল্প কমিয়া আসিল। একটু বসিবার মত স্থান পাইলাম। বৈদ্যনাথেও অনেক যাত্রী অবতরণ করিল। তখন বসিতে পাইয়াছি স্মৃতাং শয়নের চেষ্টা হইল। কিন্তু বড় সুবিধা হইল না। বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। বাষ্পীয়যান সুখ দুঃখের অতীত—অগ্নের সুখ, দুঃখ, বেদনা সে কেমন করিয়া বুঝিবে—সে কেবল জানে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে, তারপর বিষম চীৎকার করিয়া ছুটিয়া যাইতে।

কত দেশ, কত জনপদ, কত নদী, কত তীর্থ পশ্চাতে ফেলিয়া গাড়ি উদ্যম গতিতে ছুটিয়াছে—তার রাত্রি দিন উভয়ই সমান—আলো-অন্ধকার তুল্য—ছায়া রোদ্দ একই! গাড়ি যত ছোটো—মন তত আনন্দে উধাও হইয়া উঠে। অজ্ঞাত দেশ দেখিবার কেমন যে একটা উদ্যম উল্লাস—অধীর ব্যাকুলতা; তাহার তুলনায় দ্রুত গমনশীল মেলের গতিকেও মুছ ও মত্তর বলিয়া অনুমিত হইল।

যাঁহারা আগরা ছাড়াইয়া গিয়াছেন তাঁহারা “এটোয়া” নামক রেলওয়ে ষ্টেশনটি পথে ফেলিয়া গিয়াছেন। এটোয়ার কোনরূপ প্রসিদ্ধ তীর্থ বা দেবদেবীর মন্দির নাই বলিয়া তাহার প্রতি কাহারও বড় একটা দৃষ্টি পড়ে না। সেই একঘেয়ে অপরিহার্য জনার ও ভুট্টা মিশ্রিত আটার ‘পুরি’ ভিন্ন এখানে রসনার তৃপ্তিকর কিছু আহাৰ্য্য পাওয়া যায় না। অন্নগতপ্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে দুই তিন দিন ক্রমাগত ‘পুরি’ উপর নির্ভর করিয়া থাকা বড় কষ্টকর। সে অভিজ্ঞতা যাঁহার নাই, তাঁহাকে সে কষ্ট বোঝান স্কঠিন। রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে, তুমি সবেমাত্র মুখ বাহির করিয়া কোন পরিচিত মুখ দেখিবার আশায় এদিক ওদিক চাহিতেছ, অমনি মিঠাইওয়ালা তোমার কাণের কাছে হাঁকিয়া গেল—“বাবু, পুরি মিঠাই।” কেবলই সেই, পুরি—কি ভয়ানক ! অদৃষ্টের হৃৎধের মত, ক্ষতের জ্বালার মত, অভিশাপ বার্তার মত, পশ্চিমের সারা পথে ‘পুরি’ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। ‘পুরি’ এই শব্দ শুনিলেই একটা আতঙ্ক মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। তখনকার দিনে পাঞ্জাব-মেল বা ডাক গাড়ির সাধারণতঃ এটোয়া পৌঁছিতে রাত্রি ৮টা বাজিত। এই সকল কারণে দূর তীর্থযাত্রী বা অন্য কোন আরোহীর গাড়ি হইতে নামিবার বড় একটা সুবিধা বা ইচ্ছা হয় না। সুতরাং এটোয়া একটা বড় ষ্টেশন হইলেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু এটোয়ার পৃথিব্রাজের দুর্গ ছিল বা তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে, বোধ হয় অনেকেই ইহার খবর রাখেন না। এই দুর্গটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে মাটির নিম্নিত। মাটির দুর্গ, সহজেই সকলের মনে আজি-কালিকার দিনে একটা হাস্যরসের অবতারণা করে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি,

যে বর্ণিতদুর্গ যুক্তিগঠিত হইলেও প্রচণ্ড পাঠান-বাহিনীর আক্রমণ হইতে পুনঃ পুনঃ আত্মরক্ষা করিয়া আজও সে মরিয়া বাঁচিয়া আছে। এটোয়া আজও তাহার উজ্জ্বল গরিমা-গাথা সগর্বে জন-সমাজে ঘোষণা করিতেছে। পশ্চিমের নানাস্থানে বিপুল শক্তিশালী দুর্গসকল এখনও অতীতগৌরবের চিত্তস্বরূপ বিद्यমান আছে। দিল্লী, আজমীর, জয়পুর, চিতোর, উদয়পুর প্রভৃতির দুর্গ সকল অনেকেই দেখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, এটোয়ার দুর্গটি তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

এটোয়া কলিকাতা হইতে ৭২০ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমান রেলওয়ে স্টেশন হইতে সহরটি প্রায় দেড় মাইল দূরে। এই স্টেশনে নামিয়া উটের গাড়িতে করিয়া অনেকেই মৈণপুরী, ফরকাবাদ, আগরা, গোয়ালিয়র, প্রভৃতি স্থানে যাইয়া থাকেন। রেলওয়ের সুবিধা সত্ত্বেও উটের গাড়ির বহুল প্রচলন এখনও দেখা যায়। এটোয়া স্টেশন হইতে একটি সুন্দর রাস্তা সহরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। রাস্তাটির দুই পার্শ্বে সম-উচ্চ নিম্ন-বৃক্ষ-শ্রেণী ছায়া বিস্তার করিয়া রাস্তাটিকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। এই রাস্তার উপর একটি বেশ বড় রকম ধর্মশালা আছে। এ সকল অঞ্চলে নিম্নবৃক্ষের প্রাধান্য বড় বেশী, এমন কি এখানকার অনেক বাটীর দরজা-জানালা নিম্ন কাঠে প্রস্তুত। প্রাতঃকালে যখন এই সকল বৃক্ষ যুহু পবনে হিল্লোলিত হইতে থাকে, তখন প্রাণ একটা অপূর্ণ আনন্দে ভরিয়া যায়; শরীরে নববলের সঞ্চার হয়, নির্মল বায়ুর প্রাণময়ী শক্তি প্রতি শিরায় অনুভব করা যায়।

এটোয়া সম্বন্ধে আর দুই চারিটা কথা না বলিলে এটোয়ার

আতিথ্যের প্রতি আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। যে কয়দিন এটোয়ার কাটাইয়া আসিয়াছি, সেই কয়দিন তাহার জলবায়ু আমার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিল, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। অনেকে বলেন—এখানকার জল বাঙ্গালার দুধ অপেক্ষা উত্তম ও উপাদেয়—সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

আজকাল বাঙ্গালী চাকুরীর জন্ম, স্বাস্থ্যের জন্ম, ভ্রমণের জন্ম গৃহের আঙ্গিনা ছাড়িয়া প্রবাসে বাইতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে,—এটা বড় আশা ও সুখের কথা। এই উপনন্দে ভূগোলবর্ণিত ভারতের ঐতিহাসিক অভিনয়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী আপনাকে দেখিয়া যে বিপুল আনন্দ অনুভব করে, তাহার গভীরতা, তাহার প্রাণারামতা, নিজে বুঝিয়া ও দেখিয়া আসিয়াছি। আপনার গৃহে আপনি পর হইয়া থাকিলে সে গৃহের সুখশান্তি যেমন প্রীতিকর হয় না, সেইরূপ আপনার দেশের গৌরব-কীর্তি পরের মুখে শুনিলে বা অপরের দৃষ্টিতে দেখিলে তাহা হৃদয়ের সহিত অনুভব করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

আমাদের বর্ণনীয় এটোয়ার দুর্গ প্রাচীন ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। বহু শতাব্দী পূর্বে এটোয়া হিন্দুর অধিকারভুক্ত ছিল, বহুদিন ধরিয়া এই সৌন্দর্যশালিনী নগরী তাহার সুখ-সৌন্দর্য্য হিন্দুর সেবায় নিযুক্ত করিয়া, স্বীয় গৌরবকাহিনীতে নানা দেশের রাজত্ববর্গের কর্ণকুহর পরিপূরিত করিয়াছিল। এই পুরাতন এটোয়ার গৌরবস্বত্তি এখন অন্ধকারগর্ভে নিমজ্জিত।

নগরের কর্ণ-বেষ্টন করিয়া, কলনাদিনী কালিন্দী ধীরে প্রবাহিত স্টেশন হইতে যমুনা দুই মাইল মাত্র দূর। এই যমুনার গর্ভ হইতেই পৃথ্বীরাজের দুর্গ উথিত হইয়াছে। দুর্গের পাদমূল হইতে

এটোয়া ।

১৯

যমুনা এখন কিছু দূর সরিয়া গিয়াছে। যমুনার স্নেহবিচ্যুত হইয়া দুর্গটি যেন হুঃখে আপনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভগ্নস্তুপে পরিণত করিয়া পড়িয়া আছে।

যখন শুনিলাম পৃথ্বীরাজের দুর্গ এইখানে, এবং এই ভগ্নস্তুপই একটা অতীতগৌরবের স্মৃতির সহিত সংলগ্ন, যখন জানিলাম এই অভেদ্য দুর্গ শত সহস্র বার যবন-আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছে, তখন তাহার নববিকশিত সৌন্দর্য্য-প্রভায় আমার আনন্দ-বিস্ফারিত নয়ন মুগ্ধ হইয়া পড়িল। অনেক অতীত-কাহিনী যেন সজীব হইয়া নয়ন সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান কত কম।

এতদূর আসিয়া কেবল দুধ, ঘি, জল বায়ু লইয়া বিব্রত হইয়া রহিলাম ; যে দেশে আসিয়াছি, সে দেশের কোন সংবাদ লইলাম না। পরদিন এটোয়া সহর দেখিতে বহির্গত হইলাম। এখানে অনেকগুলি ছোট বড় বাজার আছে। একটা হাঁসপাতাল, আদালত ও স্কুল আছে। বুঝিলাম, এখানে নানাজাতীয় বণিকেরা বেশ রীতিমত কারবার করিয়া থাকেন। দেখিলাম, সহরের রাস্তার দুই ধারে বড় বড় কারবারীর দোকান। দোকানে নানা দেশ হইতে পাইকারগণ আসিয়া খরিদ বিক্রয় করিয়া থাকেন। অনেকে অবশ্য জানেন যে, এটোয়ার ঘি খুব প্রসিদ্ধ ; এখানে ঘি, তুলা সতরঞ্চ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল দ্রব্য নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এখানে বাঙ্গালী নাই বলিলে চলে। একজন মাত্র বাঙ্গালীর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। শুনিলাম, তিনি সিমলা-শৈলে কণ্ঠ করেন, বাড়ী হুগলি জেলায়, ম্যালেরিয়ার ভয়ে বড় একটা দেশে যান না। ছুটি লইয়া বায়ুপরিবর্তনের জন্য

এখানে আসিয়াছেন, প্রতি বৎসরই নাকি তিনি এমনি সময় আসিয়া থাকেন। তিনি এখন ষ্টেশনের নিকট একটি ধর্মশালায় বাস করিতেছেন।

একদিন বৃদ্ধ চাকর রামসিংকে ডাকিয়া নিকটে বসিতে আদেশ করিলাম; তাহাকে এটোয়া সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলাম। রামসিং আমার এটোয়ায় নিয়োজিত চাকর। বৃদ্ধ কয়দিন বেশ যত্ন করিয়া আমার কাজকর্ম করিতেছে। সে আমার অবসরের সঙ্গী। যখন পুস্তকাদি পাঠে তৃপ্তি অনুভব করিতাম না, তখন রামসিংএর আশ্রয় ভিন্ন আমার গতি ছিল না। রামসিংএর নিকট এটোয়া সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিলাম। আহা বেচারি কেমন ছলিয়া ছলিয়া সুর করিয়া গল্প বলিত। বলিতে বলিতে যেন তাহার শরীরের মধ্যে পুলক-সঞ্চার হইত। যুদ্ধের কথা বলিতে গিয়া সে খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিত। দৃঢ়হীন মুখ হইতে কথাগুলি এত তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হইত যে, আমি সবগুলি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম না। একদিন তাহাকে বলিলাম, “চল, রামসিং, আমরা যমুনায়া স্নান করিয়া পৃথ্বীরাজের অভেদ্য দুর্গ দেখিয়া জীবন সার্থক করিয়া আসি।” রামসিং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল “বাবু, আপনি দিল্লী আগরা হইয়া আসিতেছেন, মোগল-পাঠানের সুদৃঢ় ও সুগঠিত প্রস্তর-নির্মিত সে সকল দুর্গের তুলনায় কি এই ভগ্নদুর্গ দেখিতে ভাল লাগিবে? এই দুর্গের এখন আর পূর্বের সুখসম্পদ কিছুই নাই। তবে শত শত বর্ষা ও সহস্র ঝঞ্ঝা মস্তকে বহিয়া এখনও যে সে দাঁড়াইয়া আছে ইহাই বিচিত্র।” বৃদ্ধ এই দুর্গসংশ্লিষ্ট কিংবদন্তীর অবতারণা করিবার এ অবসর ছাড়িল না। সে আরও বলিল, “শুনিয়াছি, মুসলমানেরা শত সহস্রবার এই দুর্গ আক্রমণ

করিয়ছিল, তথাপি ভগ্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। মাটির
কেল্লার এত গৌরববিত্তব শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।
পৃথ্বীরাজের নামের সহিত এই দুর্গের নাম সংলগ্ন থাকায় একটি
অপূর্ব প্রীতিস্পর্কায় আমার হৃদয় ফুলিয়া উঠিল। অশিক্ষিত
রামসিং, বাঙ্গালীর দাসত্বে নিয়োজিত রামসিং, সেও তাহার দেশের
ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক গল্প ও কাহিনী কেমন সংগ্রহ করে? আর
আমরা এত অর্থব্যয় করিয়া এতদূর আসিয়া কেবল ভগ্নস্বাস্থ্যের
পুনরুদ্ধার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি।

এখানে এটোয়া সংক্রান্ত আরো দুই চারিটি কথার উল্লেখ
করিব। এখানকার রাস্তাগুলি ঠিক “সুইচব্র্যাক রেলওয়ের”
মত, কোথাও খুব উচ্চে উঠিতে হয়, কোথাও বা অত্যন্ত নিম্নে
নামিয়া যাইতে হয়। নিম্নে অসমতল ক্ষেত্রের উপর ছোট-বড়
বাড়ীগুলি চিত্রপটে অঙ্কিত ছবির ন্যায় পরে পরে, স্তরে স্তরে
দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা মৃত্তিকাস্তূপের ভিতর হইতে
ইমারত দৃষ্টিগোচর হয়; দেখিলে বোধ হয় যেন ভয়ানক
ভূমিকম্পে সমগ্র নগরটী উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। কোন
কোন জায়গায় রাস্তা কাহারও কাহারও বাটীর ছাদ অপেক্ষা
উচ্চস্থান দিয়া চলিয়াছে, রাস্তাগুলি এত উচ্চে অবস্থিত যে, নিম্নস্থ
সকল বস্তুই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখায়। নিম্নস্থ রাস্তা দিয়া চলিতে
চলিতে উপরিস্থিত বাটীর দিকে চাহিলে মস্তকের পাগড়ী খুলিয়া
পড়িয়া যায়।

এটোয়া সহরটী বহু প্রাচীন। এখানে অনেক হিন্দু ও মুসল-
মানের বাস। সহরটীর বর্তমান অবস্থা দেখিলে বেশ অনুমান করা
যায় ইহার উপর দিয়া অনেক ভয়ানক ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

তখনই মনে পড়িয়া যায় সেই ১১২৪ সাল, তখনই মনে পড়িয়া যায় মহম্মদঘোরীর সেই ভয়াবহ যুদ্ধের কথা, সন্ধে সন্ধে পৃথ্বীরাজের অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী। এই সমৃদ্ধিসংযুক্তা হিন্দুরাজধানীর শিল্প-বাণিজ্য একদিন সমগ্র হিন্দুস্থানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু যেদিন সুলতান মামুদ তাহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে এটোয়া হতসর্বস্ব হইয়া কান্দালিনী সাজিয়াছে। সমগ্র এটোয়াকে একটা দুর্গ বলা যায়। মধ্যে প্রশস্ত সরল পথ নাই যে, বহুসংখ্যক সৈন্য একসঙ্গে পরিচালিত করা যায়। ইহার চতুর্দিক মৃত্তিকাপ্রাচীর ও যমুনার দ্বারা সুরক্ষিত। এখানকার হিন্দু-মুসলমানগণ সকলেই পায়জামা ও টুপি পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভিতর মোগল সভ্যতার আদবকায়দা এখনও বেশ পরিলক্ষিত হয়। সেই মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়া সেলাম এখনও তাঁহাদের ভিতর পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত রহিয়াছে। সহরটির চারিদিকে মাটির পাহাড়। এমন পাষণদৃশ্য কঠিন মৃত্তিকা আর কোথাও দেখা যায় না। এ সকল অঞ্চলে বৃষ্টি খুব কম হয়। কিন্তু বৃষ্টি অধিক হইলেও সে জলে এই সকল কঠিন মৃত্তিকার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

অল্পদূর আসিয়া একটা বড় পাহাড়ের মত উচ্চস্থান দেখিতে পাইলাম, অনুসন্ধানে বুঝিলাম ঐটিই পৃথ্বীরাজের দুর্গ। পৃথ্বীরাজের দুর্গ ঐখানে জানিয়া সহসা দুর্গের সম্মুখে মস্তক নত হইয়া পড়িল। চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একটা অতীতের পর্দা সরিয়া পড়িল, আমি স্বপ্নমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িলাম। বোধ হইল যেন দুর্গের ভিতর হইতে যুদ্ধোন্মুখ রাজপুত সৈন্তের কোলাহল উথিত হইতেছে; অশ্বের পদশব্দে যেন চতুর্দিক ভরিয়া উঠিল; রাজপুত রমণীগণের রণ-সঙ্গীতে

যেন কর্ণ পূরিয়া গেল। দুর্গের দিকে চাহিয়া দেখি সেই অভভেদী দুর্গচূড়ায় রাজপুত রক্তধ্বজা পত পত শব্দে মোগল-গৌরব খর্ব করিয়া উড্ডীয়মান রহিয়াছে। অগণ্য মোগল-সৈন্য দুর্গাধিকার করিতে প্রাণপণ শক্তিতে বজ্রনাদী কামান দাগিতেছে, কিন্তু শার্দূলবিক্রম রাজপুত বীরগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অসি-হস্তে অবলীলাক্রমে সেই যমতুল্য আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখীন হইতেছে। দুর্গপ্রাকারের উপর হইতে রাজপুতরমণীগণ পতি পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনের বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাদের মৃত্যুতে অণুমাত্র অনুশোচনা বা শোক প্রকাশ করিতেছেন না, দুর্গস্থ সকলের জয়ো-ল্লাসে চতুর্দিক পরিপূরিত হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় সহস্রা রামসিং বলিল,—“বাবু এইখান দিয়া দুর্গোপরি যাইবার পথ; যদি উপরে যাইতে ইচ্ছা করেন ত চলুন।” আমি স্বপ্নোথিতের তায় তাহার সঙ্গে কাঁটা-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত দুর্গের উপর উঠিলাম। সেইখান হইতে যমুনা বেশ দেখা যায়। সে তটপ্রাভিনী, কৃষ্ণ-বিলাসিনী যমুনা আর তেমন নাই, উদাসিনীর তায় সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির কোলে মৃতের মত পড়িয়া আছে। অতীতের অনন্ত কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্ত, যেন দুর্গের পার্শ্বে এখন কোনমতে প্রবাহিত হইয়া, কবির কল্পনা জাগাইতে যেন শত হস্ত প্রসারিত করিয়া দুর্গপ্রাকার আলিঙ্গন করিতেছে। এইখান হইতে দুর্গাভ্যন্তরস্থ একটা ইষ্টকনির্মিত বৃহৎ বাটী দেখা যায়, উহা নাকি পৃথ্বীরাজের দুর্গস্থিত বাসভবন। গবাক্ষ কপাট-বিহীন, বাসভবনটি নরকঙ্কালের তায় কালের কঠোর শক্তি ঘোষিত করিতেছে। দুর্গের ভিতর হইতে পয়ঃপ্রণালীগুলি আসিয়া যমুনায় পড়িয়াছে। ঐ জলনির্গমের পথগুলি যেন এখনও নূতন রহিয়াছে। দুর্গের ভিতর প্রবেশ

করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সত্য বলিতে কি, সাহসে কুলাইল না। সুতরাং দুর্গের অভ্যন্তর সম্বন্ধে কোন বিশেষ সংবাদ দ্বিতে পারিলাম না।

তবে শুনলাম দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক বড় বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু কোনটির ছাদ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা কক্ষগুলি ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, সংস্কার বিহনে দিন দিন এই দুর্গের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তবে কয় শতাব্দীর ঘোরতর বিপ্লববিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া সে যে আত্ম-অধিকার রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহা হিন্দুভাস্করদিগের অত্যাশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের গুণে; কিন্তু আর বুঝি পারে না। এই দুর্গের অনতিদূরে মনুমেন্ট অপেক্ষা অধিক উচ্চ এক শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, শিবলিঙ্গ পৃথ্বীরাজের দ্বারা স্থাপিত। দৈনিক পূজার বন্দোবস্ত এখনও ঠিক চলিতেছে। পৃথ্বীরাজের কণা নাকি প্রতিদিন এই একলিঙ্গ শিবের আরাধনা করিতেন। আনন্দ উৎসাহে, হর্ষে বিবাদে ছুটিয়া গিয়া মন্দিরে উঠিলাম, তখন কত কথা মনে পড়িল, কত ইতিহাসের বর্ণনীয় চিত্র বাস্তবে পরিণত হইয়া উঠিল; চক্ষে জল আসিল। সেখান হইতে একবার দুর্গের দিকে, একবার নিম্নপ্রবাহিনী যমুনার দিকে, এটোয়ার দিকে অনিমেষ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলাম। আগ্রহ-আকাজ্জা-উৎসাহ-পরিপূরিত হৃদয়ে মহেশ্বরের চরণপদ্মে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার আশীর্ব্বাদের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের দুর্গের স্মৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া আনিয়াছি। তবে এই দুর্গ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা করিবার ক্ষমতা বা শক্তি আমার নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে পাঠকের আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। কোন ঐতিহাসিক যদি এই দুর্গের অজ্ঞেয়ত্ব আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে হয়ত আমরা অনেক বিষয় জানিতে পারিব।

কালকা পথে ।

সে আজ দুই বৎসরের কথা হইলেও বেশ স্মরণ আছে । একদিন ভোর হয় হয়, টুণ্ডুলার বাসার শয্যায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছি, শীতের ঠাণ্ডা বাতাস জানালার ফাঁক দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতেছে । আলম্বনশতঃ অন্ধকারকে আরও খানিকক্ষণ থাকিবার নিমিত্ত অনুনয় অনুরোধ করিতেছি ; এমন সময় আমাদের বাসার নীচে হইতে কে যেন বিকট চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিতে লাগিল । হিমনিষিক্ত বাতাসে বোঝা যাইতেছিল না যে, স্বরটি বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানীর কণ্ঠনিঃসৃত । কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । আমাদের সিঁড়ীর দরজায় যষ্টির আঘাত শুরু হইল । কোথা হইতে আপদ আসিল মনে করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম । তার পর যাহা দেখিলাম তাহাতে অঙ্গ শীতল হইয়া গেল ! মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধা, সমস্ত শরীর কষলে আচ্ছাদিত, নাগরা পায়ে, দুইজন স্থলকায় হিন্দুস্থানী ! তাজ্জব ব্যাপার ! তাহারাও আমার মত একজন সুপ্তোখিত দুর্বল বাঙ্গালীকে নিরীক্ষণ করিয়া নির্বাক ! পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি একবার নৈরাশ্রের শূন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম ।

৩পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে গিয়া টুণ্ডুলায় আমার একটা বন্ধুর বাসায় অবস্থান করিতেছিলাম । বন্ধুর চোখ উঠার জন্য বড় কষ্ট পাইতেছিলেন । তিনি পরিবার লইয়া ভিতর বাড়ীতে থাকেন ; আমি বহির্বাটিতে থাকি । সুতরাং এই হাদ্ধামা তাঁহাকে পোহাইতে হইল না । চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমরা

কাহার অনুসন্ধান করিতেছ ?” আমার বন্ধু যে আপিসে কর্ম করেন, সেই আপিসের জয়শঙ্কর বাবুর আত্মীয় বলিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিল। জয়শঙ্কর বাবুর সহিত আমার ইতিপূর্বেই বিশেষ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি বড়ই ভদ্রলোক। আমি আগন্তুকদিগকে সঙ্গ করিয়া তাঁহার বাসা চিনাইয়া দিয়া আসিলাম।

ইতিপূর্বেই আমার তাজ, সিকান্দ্রা প্রভৃতি দেখা হইয়া গিয়াছিল। সে দিন আর কোনখানে যাইবার কথা ছিল না। মধ্যাহ্নে প্লাটফর্মে গিয়া বসিয়া রহিলাম। বাঙ্গালী বাতী দেখিলেই ছুটিয়া গাড়ীর নিকট গিয়া উপস্থিত হই। নানাপ্রকার প্রশ্নাদিতে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করি।

পরদিন সকালে বিছানায় পড়িয়া আছি—রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই। গৃহে অন্ন অন্ন আলো আসিয়াছে। এমন সময় শুনিলাম—“ও মহাশয়, আপনি কৈ? বলি বিদেশে বায়ুপরিবর্তন করিতে আসিয়া কি এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাইতে হয়? উঠুন! উঠুন!” কণ্ঠস্বর বেশ পরিচিত বলিয়া মনে হইল। এত ভোরে কে আসিল! দোড়াইয়া গিয়া দ্বার উদঘাটন করিয়া দিতে না দিতে, ভদ্রলোক বাহির হইতে বলিলেন,—“এ যে দেখছি এখনও আপনার চোখে ঘুম জড়িয়ে রয়েছে।”

আমি বলিলাম, “উপেন সাহেব যে, এত ভোরে কেমন করে এলে?” আমরা তাঁহাকে সাহেব বলিয়া ডাকিতাম; কারণ তিনি প্রায় সাহেবী ধরণের পোষাক পরিতেন। তিনি উত্তর করিলেন, “কলের গাড়ী করে।”

“এখন ত কোন up train নাই, আসিলেন কেমন করিয়া?”

“up না থাকতে পারে, down ত আছে।”

“up এই বা গেলেন কবে?”

“Inquistive হওয়া চাই! পড়ে পড়ে ঘুমুলে হয় না। চলুন, ধুড়া চুড়া ছেড়ে একবার খাঁটি স্বদেশী হই। তার পর সব কথা হবে।”

তখন উভয়ে গৃহের মধ্যে আসিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন,—
“তোমার আলিগড় যাবার খবর পথে পাই। সে জন্ত বরাবর আলিগড় গিয়া অবতরণ করি। সেখানে শুনিলাম তুমি সেখান হইতে আজ চার পাঁচ দিন টুঙলায় চলিয়া আসিয়াছ। অমনি পরবর্তী ট্রেনের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া জানিলাম, ডাউন মেল ছাড়া আর গাড়ী নাই। তাহাতেই চড়িয়া বসিলাম। এখানে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে গাড়ী পৌঁছিয়াছিল। কেবল পথে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। অক্ষয়বাবু কেমন আছে বল?” এমন সময় অক্ষয়বাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। সে দিন বড় আনন্দে কাটিল। মধ্যাহ্নে পরামর্শ হইল, কাল্কা দেখিয়া আসা যাক। উপেন বাবু বলিলেন, “কেবল উইয়ের টিপি দেখিয়া রাখিয়াছেন, চলুন পাহাড় কাহাকে বলে একবার দেখিয়া আসিবেন।”

সেই রাত্রে আহাঙ্গাদির পর টুঙলা হইতে কাল্কার পথে রওনা হওয়া গেল। কথা রহিল, আমরা ফিরিয়া পুনরায় টুঙলায় আসিব; কারণ অক্ষয় বাবু তাহার চোখের জন্ত আমাদের সঙ্গী হইতে পারিলেন না। গাড়ী উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিল।

সারা রাত্রি বাষ্পযান ছুটিয়া চলিল। বন্ধুপ্রবর নিদ্রাদেবীর বড় ভক্ত ও অনুরক্ত সেবক। আমরা যে কম্পার্টমেন্টে উঠিয়াছিলাম তাহাতে অণু কোন আরোহী ছিল না; সুতরাং তিনি কখন মুড়ি দিয়া বিকট নাসিকা-গর্জনে ক্ষুদ্র গাড়ীখানিকে শব্দান্দোলিত করিয়া তুলিলেন। গাড়ী যতই কাল্কা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, ততই

হিমকণা সমস্ত জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কোথায় ক্ষুদ্র কোন রক্তপথে প্রবেশ করিয়া স্নেহালিঙ্গন আবেশে শরীর অসাড় করিবার উপক্রম করিতেছে। উঃ! সে কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! গরম কোট ও কম্বলে অনেকটা নিরাপদ থাকিব মনে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল তুষার-কিরীটি হিমাদ্রির দূতটি বড় উপেক্ষার লোক নন। তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। গাড়ী অনেকক্ষণ অন্তর মাঝে মাঝে বিশ্রাম লইতেছে। এবার যেখানে তাহার উদ্দ্যম গতি সহসা নিস্তেজ ও নীরব হইয়া আসিল, জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিলাম, সেস্থানের নাম ষ্টেশনের উপর পাথরের গাত্রে বড় বড় অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে “দিল্লী”। আমি পূর্বে কখনো দিল্লী আসি নাই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সময় ও ভাড়া নিরূপণ পুস্তক লইয়া বহুবার তাহার দূরত্ব ও ভাড়া লইয়া অঙ্কপাত করিয়াছি মাত্র। আজ দিল্লীর ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে অনেক পুরাতন কথা মনে পড়িল। গাড়ী এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। এক একবার মনে হইল, এইস্থানে অবতরণ করি। যে দিল্লী হিন্দুর অতীত কাহিনী বন্ধে করিয়া কত যুগযুগান্তর হইতে, তাহার ঐশ্বর্য—তাহার লোন্মর্ধ্যের গৌরবদীপ্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে,— তাহার সহিত, তাহার স্মৃতিস্বর্ধ্যের সহিত, তাহার অতুলনীয় হর্ম্ম্য অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের সহিত, তাহার ধূলিকণার সহিত একবার প্রাণ মিলাইয়া দিই! এ নরজন্ম সার্থক করি!

কিন্তু সে গভীর রাত্রিতে নামিয়া কোথায় যাই? বন্ধুপ্রবরকে উঠাইতে বৃথা প্রয়াস পাইলাম। তিনি তখন ঘুমের ঘোরে মধুর স্বপ্নে অঙ্গান। তখন মনে পড়িল বৈচিত্র্যময়ী হস্তিনার কথা, সঙ্গে সঙ্গে আরো মনে পড়িল হিন্দুর জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার একাধিপত্য।

একদিন ছিল, যখন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইলে কি হয়, সেও লোন্প দৃষ্টিতে এই শেষ্ঠাময়ী বীরপ্রসবিনী বীরভোগ্যা হস্তিনার প্রতি চাহিয়া থাকিত। ইহারই কোলে কত রাজ্যবর্গ কত খেলাই না খেলিয়াছেন? কত ভীষণ সংগ্রামের দুর্ধর্ষ সংঘাতে কত রাজবংশ চিরদিনের জন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। কোথায় আজ সে হস্তিনার স্মৃতি-স্বর্ষ! কোথায় বা তাহার বীরপুত্রগণ!

গাড়ী পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল। গতি তেমনি উদ্যম, তেমনি দ্রুত। এবার আর শয়ন করিলাম না, জানালার কাঁচের উপর মুখ রাখিয়া দেখিতে লাগিলাম। কাঁচের উপর মুক্তার তায় শিশিরকণা জমিয়া থাকায় বাহিরের দৃশ্য বড়ই অস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। চন্দ্রদেব পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। আকাশ, মেঘ, মুক্ত-প্রান্তর যেন নিশীথে নীরবে মধুর মিলনে মিলিয়াছে। যেন প্রকৃতি সতী ধরণীর বক্ষে বিরাম-নিদ্রায় অভিভূত, প্রেমিকের প্রীতিঅঙ্কুর ন্যায় নিহারবিন্দুগুলি তাহার বক্ষে কণ্ঠে জড়াইয়া রহিয়াছে। শান্ত নীরব নিশা। দূরে, বহুদূরে অস্পষ্ট আবছায়ার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি দৃশ্যপথে এক একবার পড়িয়া তখনি বায়স্কোপের চিত্রের মত মিলাইয়া যাইতেছিল। এরূপ মনোরম দৃশ্য বুঝি কখনই দেখিব না।

যখন সেই শীতের ভোর রাতে উষার প্রথম বাতাস অল্প অল্প বহিতে সুরু করিয়াছে, তখন গাড়ী পাণিপথ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। তাড়াতাড়ি জানালার কাঁচখানি নামাইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি দিগন্তব্যাপী মুক্ত প্রান্তর। মাঝে মাঝে শাল, মোঁ ও বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষরাজি শিশিরমণ্ডিত; যেন অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিয়া নয়নজলে ভাসিতেছে। মনে হইল এই সেই রণক্ষেত্র, যেখানে কতবার ভারতের ভাগ্য পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, যেখানে

রাজপুত তাহার অসীম বীরত্ব দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে রণশয্যা চিরশয়ন করিয়াছে। তারপর যখন কুরুক্ষেত্রে আসিয়া গাড়ী পৌঁছিল তখন এক অজ্ঞাত আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এই সেই স্থান—যেখানে ভারতের ধর্মযুদ্ধ হইয়াছিল,—যে পবিত্র স্থানে অষ্টাদশ অক্ষোহিনী সৈন্য একদিন এক সময়ে সমবেত হইয়াছিল। যে যজ্ঞে ভারত তাহার সমগ্র বীরশক্তি, ঐশ্বর্য্য বিসর্জন করিয়াছিল,—এই সেই মহাভারত-কথিত “কুরুক্ষেত্র”। “কুরুক্ষেত্র” এই কথা শ্রবণ হইতে হৃদয় দুঃখে, হর্ষে কেমন হইয়া গেল। মনে হইল, যেন কোন অজানা দেশে স্বপ্নাবেশে ভাসিয়া চলিয়াছি—আমাকে যেন দুর্ব্বল বঙ্গবাসী বলিয়া আর মনে করিতে বাসনা হইল না। মনে হইল আমিও যেন জন্ম জন্মান্তরে ঐ যুদ্ধে কেহ ছিলাম। আমিও যেন উভয় সৈন্যের মধ্যস্থিত রথে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে, অর্জুনের সারথ্য করিতে অবলোকন করিয়াছি,—আমিও যেন তাহার পলাশপুষ্পবৎ আরক্তিম চরণকমলে অন্ত নিষ্কেপ করিয়া নিজেই কৃতার্থ করিতে বিমুখ হই নাই! ধন্য কল্লনা! ধন্য তোমায়! যাক্, এত বেশী কথা বোধ হর অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। এইবার কাল্কার কথা বলিয়া প্রবন্ধের নামের সার্থকতা করিতে প্রয়াস পাইব।

এইবার মেল্ ট্রেণ কর্ণাল আসিয়া থামিল। বলিতে ভুলিয়াছি, দিল্লীর পর হইতে মেলের উদ্দাম গতি কিছু মন্দ হইয়া আসিতেছিল; কারণ এবার গাড়ীকে ক্রমে ক্রমে উঁচুতে উঠিতে হইতেছে। এখন হইতে মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড মেঘের ন্যায় দূরে ছোট বড় পর্ব্বতশ্রেণী নয়নগোচর হইতেছিল। কর্ণাল একটা অতি প্রাচীন নগর। কথিত আছে, মহাবীর কর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের

নিকট বলিয়া এই স্থানে তাঁহার রাজধানী সংস্থাপন করেন। সে আজ কত যুগযুগান্তরের কথা। তবুও কি আশ্চর্য্য! যখন গাড়ী কর্ণালে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন যেন অজ্ঞাতভাবে অতীত ঘটনাগুলি নিদ্রোথিত শিশুর ন্যায় কল্পনার কোলে নাচিয়া উঠিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ, ব্যাস, ভৃগুরাম যেন সব সেদিনকার লোক, যেন অনতিকালপূর্বেই, এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যেন পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি বাতাসে এখনও ধ্বনিত হইতেছে, যেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত গীতার শ্লোকগুলির শেষ উচ্চারণ এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই।

পাঁচটার সময় আমাদের গাড়ী থানেখর পার হইয়া গেল। ইহার পর পথের কোন কথা আর তেমন উল্লেখযোগ্য বলিয়া অরণ হয় না। এই সময় বন্ধুবর নিদ্রা হইতে উঠিলেন ও বলিলেন, “উঃ বড় শীত! এত শীত কখন আসিল? আপনার শীত করিতেছে না?” আমি বলিলাম, “আর একটু নিদ্রা দিন, আর কেন, সামান্যের জন্য জাগিয়া থাকিবেন?” তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আপনার মত ত আর আমার বাতিক প্রবল হয় নাই যে, গাছপালা পাহাড় দেখিয়া এই দারুণ শীতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিব।”

সকাল সাতটার সময় পাঞ্জাব মেল্ বহু সাধ্যসাধনার পর আকাজ্কিত কাল্কায়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। কাল্কা কলিকাতা হইতে ১০৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত। সমতলভূমি হইতে ২০০০ ফুট উচ্চ। এই খানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেল শেষ হইয়াছে। এখান হইতে কাল্কা-সিমলা রেলে চড়িয়া সিমলা যাইতে হয়। গাড়িগুলি বড় ছোটো। চারিজন আরোহী একত্র

বসিলে বড় ব্যাসাঘেষি হয়। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখি, আমাদের পরিচিত নগেন বাবু ষ্টেশনে বেড়াইতেছেন। পূর্ব হইতে জানিতাম, তিনি কাল্‌কায় কৰ্ম করেন। তিনি আমাদের পাইয়া বিশেষ আশ্লাদিত হইলেন। নানাপ্রকার কুশলাদি প্রশ্নে আপ্যায়িত করিতে করিতে তাঁহার বাসায় গিয়া উঠিলাম। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী দুইজনে এখানে থাকেন। উপেনবাবুর বাসা সমতল-ভূমি হইতে কিছু উচ্চে ও পাহাড়ের কোলে। চারিদিকে অভভেদী পর্বতশ্রেণী। কাল্‌কা, আকাশ ও পাহাড়ের মহা সম্মিলন-ক্ষেত্র। আমরা আমাদের জিনিসপত্র রাখিয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইতে উত্তত হইলাম। তিনি অনুরোধ করিলেন “আহারাদির পর যাইবেন।” আমি বলিলাম, “তাহাই হইবে—তবে কি না, অনেকক্ষণ পর্যন্ত না চলিয়া পা একপ্রকার অসাড় হইয়া গিয়াছে, একটু ছাড়াইয়া আনি।” এক এক পেয়ালা চা খাইয়া, বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। উপেন বাবু বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, যেন বেশী বিলম্ব না হয়।

পথে বাহির হইতেই কি এক অজানা আনন্দে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ষ্টেশনের সম্মুখ হইতে ধূলিসমাচ্ছন্ন কাল পাথরে মোড়া মল-রোড বাহির হইয়া পর্বতগৃহের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। রাস্তাটি যেন জাহাজে উঠিবার জেটির মত ক্রমে ক্রমে উঁচু হইয়া গিয়াছে। এইখানে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘোড়া লইয়া পাহাড়ীরা যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। যদিও এখন কাল্‌কা হইতে রেলপথ পাহাড়ের গাত্র বেষ্টিত করিয়া ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারের অপূর্ব বুদ্ধি, কৌশল ও শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া কখন উপরে উঠিয়া কখন নীচে নামিয়া পাহাড়ের বন্ধের উপর দিয়া

সিমলা পর্য্যন্ত গিয়াছে, তথাপি পূর্ব সময়ের ব্যবহৃত “টঙ্কা” এখনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। টঙ্কার ভাড়া রেলভাড়া অপেক্ষা না কি কম। এখনও অনেকে রেলগাড়ী অপেক্ষা টঙ্কা অধিক পছন্দ করেন।

অল্পদূর অগ্রসর হইয়া দেখি সারি সারি দোকান পসার। বেশ ক্ষুদ্র সহর। এখানেও নানা জাতীয় লোক ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করিতেছে। এখানকার লোক প্রায় সকলেই পাহাড়ী, হিন্দু ও মুসলমান। কাল্কা হইতে কিছুদূরে একটা সুন্দর উদ্যান আছে। উহা একজন করদ রাজার নির্মিত। উপবনের শোভা বড়ই মনোরম ও প্রীতিপ্রদ। পূর্বে যখন সিমলা পর্য্যন্ত রেল বিস্তার হয় নাই, তখন সম্ভ্রান্ত লোকেরা এই বাগানে বিশ্রাম লাভ করিয়া পরে, টঙ্কায় বা অশ্বপৃষ্ঠে সিমলায় যাত্রা করিতেন।

একটি দোকানে জলযোগ করিয়া, মল-রোড ধরিয়া চলিলাম। কোথায় যাইব, কোথায় যাইতেছি কখন বাসায় ফিরিব এরূপ কোন চিন্তাই মনে স্থান পাইল না। কেবলই চলিয়াছি। বড় আনন্দ, বিপুল উৎসাহ। এক একটা গিরিশ্রেণী যেন আমাদের সঙ্গে পথ চলিতে অসমর্থ হইয়া পশ্চাতে লুকাইয়া পড়িতেছে, তাহাদেরই পার্শ্ব হইতে বৃহৎ বৃহৎ বৃহত্তর বিস্তারের পর বিস্তার, শ্রেণীর পর শ্রেণী পর্তমান্না পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কখন দ্রুত পদবিক্ষেপে, কখন মন্থর গতিতে, কখন বা ছুটিয়া, কেবলি উঁচুতে উঠিতে সুরু করিলাম। মাঝে মাঝে নিব্বরিণীর কল কল তান, নিস্তরু পাহাড়ের কোলে বড়ই মনোহর। চতুর্দিকে গগনম্পর্শী পর্তশ্রেণী, মেঘের কোলে মস্তক হেলাইয়া যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। নিম্নে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অসরল পথ। আমার তখন পিপাসা পাইয়াছিল—মনে হইল প্রথম যেখানে জল দেখিব, তাহা আবিল হইলেও পান করিব। কিয়দূর

অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিলাম একটা স্থানে ঝরণার জল সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। দেখি অল্প দূরে পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া ঝরণার জল ঝর ঝর শব্দ করিয়া পড়িতেছে।

একটু অগ্রসর হইয়াই অঞ্জলি পূরিয়া সেই ঝরণার জল পান করিলাম। কালুকা ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে আরোহণ করিলে, একটু পরেই যে ঝরণাটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও নিতান্ত ছোট নয়। সেইখান হইতে কালুকা অঞ্চলের অধিবাসীরা জল সংগ্রহ করিয়া থাকে। সেই ঝরণার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখানকার স্নানের রীতি আমাদের চক্ষে বড়ই অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইল। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে পরিধেয় বস্ত্রাদি দূরে রাখিয়া অসংশয়ে ও অসঙ্কুচিত ভাবে একত্র স্নান ও গাত্রাদি প্রক্ষালন করিয়া থাকে। ইহাদের আচার ব্যবহারই এইরূপ! ইহাতে ইহারা কোন প্রকার অত্যাচার বা লজ্জা বোধ করে না। এই সকল ঝরণার জলের নিকট কলিকাতার কলের জল স্বচ্ছতায় আবিল বলিলে অত্যাচার বলা হয় না। এ জল যেমন নির্মল, তেমনি স্নিগ্ধ ও সুস্বাদু। জল পান করিয়া যেন সমস্ত ক্লান্তির অবসান হইল।

উৎসাহে উল্লাসে ক্রমান্বয়ে সেই পাহাড়ের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে এক এক বার থম্কিয়া দাঁড়াই, আর নিবিড় নিস্তর পর্বতের উপর আমাদের জুতার খট খট শব্দও যেন সমভিব্যাহারী সঙ্গীর মত স্তব্ধ হইয়া থামিয়া যায়। আমাদের স্বাধীন কৌতূহল, উচ্চ হাস্য ও কথোপকথনে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া বিরাট গাঙ্গীর্যের ভিতর এক অভিনব শিশু-সুলভ চাকল্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল।

এক উপলব্ধির উপর বন্ধুর উপবেশন করিলে আমিও তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। সম্মুখে একটা ঝরণা ঝির-ঝির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র ঝরণাই যে পরে সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া বিপুল কলেবরে কত দেশ বিদেশ, কত জানা অজানা স্থান, কত উর্বর অক্ষুর ক্ষেত্রে সুশীতল বারি দান করিয়া চলিয়াছে, তাহা এই ক্ষীণাঙ্গীকে অবলোকন করিলে মোটে নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

পাহাড়ের উচু নীচু পথে উঠিতে ও নামিতে বড় মন্দ ব্যায়াম হয় না। কোটের ভিতরের কামিজটি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বসিতে না বসিতেই সুশীতল বায়ুস্পর্শে তাহা এক মুহূর্তে শুকাইয়া গেল। পর্বতের জলে ও বাতাসে, জানি না, কি এক অজ্ঞাত শক্তি আছে, যাহা ক্লান্তি ও অবসাদকে শীঘ্র দূর করিয়া দেয়। বিশ্রাম করিবার বাসনা হইলেও অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিতে না করিতে, পুনরায় চলিবার ইচ্ছা অনেক বেশী পরিমাণে জাগিয়া উঠে।^১ আমরা উঠিয়া পড়িলাম। নবোৎসাহে সবে মাত্র চলিতে শুরু করিয়াছি, অমনি পাহাড়ের উপর একটা ছায়া আসিয়া পড়িল। আমাদের মাথার উপরকার মেঘাবৃত আকাশের ছায়া বলিয়া মনে হইল। পূর্বে জলধর বাবুর 'হিমালয়ে' পড়িয়াছিলাম যে, যদি পর্বতের উপর একবার বৃষ্টি শুরু হয়, তাহা অত্যন্ত ভয়ানক, কারণ সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বড় আসিয়া যোগ দেয় এবং তাহাতে সমূহ বিপদপাতের সম্ভাবনা।

নিম্নে অবিচ্ছিন্ন অনন্ত গিরিশ্রেণী,—একটির পর একটা—মনে হয় যেন ঐ শেষটির পর আর নাই;—কিন্তু তাহার পর বুঝি—সবই ভুল। যেমন দিনের পর দিনের শেষ নাই, তেমনি মনে হয়, এই

অব্রভেদী পর্বতমালার শেষ নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই ; এখানে আকাশ হিমালয়কে আলিঙ্গন করিয়াছে এবং হিমালয় আকাশকে স্নেহবাহুপাশে বন্ধ করিয়া উল্লাসে আত্মপূর্ণ জ্ঞানশূন্য হইয়াছে ।

আবার উর্দ্ধে চাহিয়া দেখি, আর মেঘের লেশমাত্র নাই ; এক ঝাঁক পাখী, আকাশ জুড়িয়া উড়িতেছে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবেত পাখায় সূর্য্যরশ্মি অবরুদ্ধ । এত পাখী এক সঙ্গে কখন দেখি নাই, শিশুর মত উর্দ্ধমুখে তাকাইয়া রহিলাম । সেগুলি কোন্ জাতীয় বিহঙ্গম, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না, আর সেই জনশূন্য পর্বত-প্রদেশে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবার মত কেহই ছিল না ।

পাহাড়ের পথ মাঝে মাঝে তৃণসমৃদ্ধ ; এই সকল শ্রামল তৃণের ভিতর আর এক রকম ছোট ছোট তৃণ পরিলক্ষিত হয়, সেগুলিও আবার নয়নাভিরাম নানা বর্ণে রঞ্জিত, ফুলভারাবনত । যেন এক এক খানি নানা বর্ণের বিচিত্র আসন অতিথি অভ্যাগতের জন্ত প্রকৃতিসুন্দরী ঝঙ্কল হস্তে পাতিয়া রাখিয়াছেন । এই বিলাস-বিহীন তৃণদলের উপর উপবেশন করিলে, হৃদয় ভক্তিভরে ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়ে; অহঙ্কার, বিলাসিতা, সব একনিমেষে বিলুপ্ত হইয়া যায় ।

আমরা একটা ঝাঁকের মুখে আসিয়া পড়িলাম । এইখান হইতে পথটি একেবারে উত্তর হইতে পশ্চিমে ফিরিয়াছে, অপর একটি সরু পথ পাহাড়ের অগ্ৰ দিকে চলিয়া গিয়াছে । আমরা এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিব ? দুই জনেই সমান পণ্ডিত, পরস্পরের মুখের প্রতি তাকাইলাম, এখানে ত আর গলির মোড়ে বা রাস্তার আরম্ভ-মুখে অমুক লেন বা স্ট্রীট, পথিকের সুবিধার জন্ত নির্দেশ করা নাই ; এখানে উর্দ্ধে আকাশ—আর নিম্নে পাহাড় ।

কোন্ দিকে যাই ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় দেখি প্রায়

দুই শত বড় বড় ছাগল ও অশ্ব, পৃষ্ঠে বোঝা বহন করিয়া সেই বড় পথে নামিয়া আসিতেছে। মনে হইল, এ আবার কি? তারপর দেখি, তাহাদের সমভিব্যাহারী পরিচালকবর্গ পাহাড়ী; হাতে বড় বড় যষ্টি, মাথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাগড়ী, সকলের অঙ্গে হাতকাটা জামা। তাহারা বেশ হুঁপুট, উন্নতবক্ষ, বিস্তৃতললাট। তাহাদের শরীরের প্রতি শিরায় যেন স্বাস্থ্য ও শক্তি পরিস্ফুট রহিয়াছে। তাহারা বিশ্বয়বিষ্কারিত নয়নে, আমাদের দিকে দৃষ্টি-নিষ্কেপ করিল। এই সময় সহসা কোথা হইতে ঝড়ের মত শব্দ উথিত হইতে লাগিল। কোথাও কিছু নাই অথচ ঝড় আসিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্ত জিজ্ঞাসা করিলাম “এ কিসের শব্দ, ঝড় এলো কি?” তাহারা প্রশ্নটা ঠিক বুঝিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, তবে তাহাদের বড় বড় অধরের উপর বিদ্যুৎ চমকের মত একটু হাসি খেলিয়া গেল। তাহারা এক্রপ শব্দের কারণ জানিত; বলিল “ও রেলগাড়ী আসছে।” কিন্তু পরক্ষণেই শব্দ নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; বন্ধু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন “যদি রেল গাড়ীর শব্দ হয়, তবে আর শোনা যাইতেছে না কেন?”

একজন সেলাম করিয়া বলিল, “হজুর, গাড়ী এখন একটা নীচু পাহাড়ে নামিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আসিতেছে, সেজ্ঞ শব্দ শুনা যাইতেছে না।” তারপর, আমাদের মাথার উপরের একটা পর্বত নির্দেশ করিয়া পুনরায় বলিল “ঐখান দিয়া রেল গিয়াছে; একটু পরেই গাড়ী দেখিতে পাইবেন।”

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা কোথায় যাইবে?”

“কাল্কার বাজারে। সেখানে এই সব মোট রাখিয়া পুনরায় মোট লইয়া ফিরিব। ইহাই আমাদের কাজ।”

“এ সব বোঝা কাহাদের ? তাহারা রেলে লইয়া যায় না কেন ?”

“সিমলার রেলের মাণ্ডল অত্যন্ত বেশী, তাই আমরা কাল্কা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসি। এই রাস্তায় ভাড়া খুব কম পড়ে।”

“রেল লাইন খুলিয়া তোমাদের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে ?”

“না, ঠিক বিপরীত হইয়াছে, আয় পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রেল হওয়ার পর লোকজন বেশী আসে, ‘মোট ঘাট’ অনেক বাড়িয়াছে, রেলের মাণ্ডল অনেক বেশী।”

তাহাদের সঙ্গে বালক, শিশু, স্ত্রীলোক। সকলের নিকট বস্ত্রাদি, আহাৰ্য্য ও শয্যা ইত্যাদি ছিল। তাহাদের বেশ রীতিনীতি, পর্ব্বতের সকল প্রদেশেই যেন তাহাদের পরিচিত ঘর ! ভয় নাই যে কোথায় গিয়া পড়িব, কোথায় আহাৰ জুটিবে, কোথায় বা শয়ন করিব। তাহারা কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

কোন পথে যাইলে নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছিতে পারিব জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিল—“হজুর, আপনারা কাল্কা হইতে সাত মাইল পথ চলিয়া আসিয়াছেন, এর একটু পরেই “টাকশাল” নামক ক্ষুদ্র গ্রাম।”

সেখানে বাজার আছে কি না অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিলাম, টাকশাল অতি সামান্য গ্রাম; তিন চার ঘর মাত্র পাহাড়ীর বাস আছে; তাহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হয় তাহা কাল্কা বাজার হইতে আনাইয়া লয়। Dandy Road নামক একটা পথ দূরবর্ত্তী পাহাড়ের গাত্রে দেখাইয়া একজন বলিল “ঐ পথ অবলম্বন করিলে খুব শীঘ্র টাকশাল স্টেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন।” সে পথটি ধরিতে আমাদের অনেকবার উচুতে

উঠিতে ও নীচে নামিতে হইল। এই সময় আবার গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইল। উর্দ্ধে চাফিয়া দেখি মাথার উপরকার একটা পাহাড়ের ধারে ধারে গাড়ী চলিয়াছে, তাহা যেন একটা “কেন্দুয়ের” মত দেখাইতে লাগিল।

ভয় হইল, হয়ত গাড়ী একটু বাধা পাইলে নিম্নস্থ গহ্বরে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আমাদের নিকট হইতে রেল লাইন প্রায় হাজার ফিট উচ্চ হইবে। এখান হইতে গাড়ীর গতি বড়ই সুন্দর মনে হইল, যেন গাড়ী একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; আবার কখন উচ্চ ধীরে ধীরে আরোহণ করিতেছে, ও পরক্ষণেই সেস্থান হইতে অনেক নিম্নে ও পশ্চাতে অবতরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

আমরা গাড়ীর গতি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে শুরু করিলাম। গাড়ী কখন আমাদের পশ্চাতে ফেলিতেছে, আর কখন বা আমরা গাড়ীকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছি। এই গাড়ী আসিতেছিল, আর নয়নগোচর হইল না। শব্দ লক্ষ্য করিয়া হাঁটিতে লাগিলাম, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে তাহাও আর শ্রুতিগোচর হইল না। যে পথটি আমাদের দেখানো হইয়াছিল তাহাও এখানে অগণ্য পথসমূহে হারাইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে কোন একটি সরু পথে Dandv road অনুমানে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। যখন অনেক দূর আরোহণ করিয়াছি, তখন আর পথ খুঁজিয়া পাইলাম না। এখান হইতে পর্বত সরল, মন্থণ ও লব্ধভাবে উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

এখন পাহাড়ের যে অংশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সেখানকার একটা দৃশ্য বড় আশ্চর্যজনক। এখানে রেল লাইন লইয়া যাইতে ইঞ্জিনিয়ারগণকে বিশেষ কষ্ট ও শ্রমস্বীকার করিতে হইয়াছে। এইস্থানে পাহাড় বিচ্ছিন্ন হইয়া এক প্রকাণ্ড গহ্বর ও

গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছে ; এবং এই বিচ্ছিন্নতাই পর্বতকে সহস্রবার বিভক্ত করিয়াছে, দুটি বিচ্ছিন্ন অংশের অন্তর বড় কম নয়, প্রায় পাঁচশত হস্তের অধিক। এইখানে টেলিগ্রাফের তার বুলিয়া পড়িয়াছে, কারণ মধ্যে কোন প্রকার অবলম্বন দিবার উপায় নাই। বোধ হয় আরোহিণ এখানে গাড়ী হইতে নিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। পূর্বেই বলিয়াছি এখানকার পাহাড় অনেক উচ্চ। নীচের দিকে চাহিলে নিম্নস্থ কিছুই দেখা যায় না। তখন বেলা প্রায় দশটা। প্রথর সূর্য্যরশ্মি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। নীচে তাকাইয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল।

তখন বন্ধুবর আমার নিকট হইতে কোন প্রকারে তিন চারি হস্ত উর্দ্ধে উঠিয়া বলিলেন, “নীচের দিকে দেখিবেন না। আসুন, শীঘ্র শীঘ্র উপরে উঠিতে চেষ্টা করি, নহিলে আর কাল্কা ফিরিতে পারিব না ; এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িলে পথ আবিষ্কার করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে।”

আশু বিপদের আশঙ্কায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। মুখে কথা সরিল না। মনে হইল এখন যে পথে আসিয়াছি সে পথে ফিরিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বর্দ্ধমান রাজবাটীতে গোলকধাঁধায় যে প্রবেশ করি নাই তাহা নহে, বা তাহার জ্ঞান যে ছিল না তাহাও নহে, তবে সেখানে সারাদিন ঘুরিয়া পথ আবিষ্কার করিতে না পারিলেও মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, শেষে গোলকধাঁধা-রক্ষক আসিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইবে ; কিন্তু আজ বিশ্বগোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছি। কে আসিয়া পথ দেখাইয়া দিবে ? সন্ধ্যার পর ত

বাব ভাল্লুক আসিয়া এই অনির্দিষ্ট অনাহত শিকার দেখিলে আহাৰে তিলান্ধি বিলম্ব করিবে না।

বন্ধুবর একটু এদিক ওদিক পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল “দেখি যদি এইখান হইতে কোন উপায় করিতে পারি।” আমি সেদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, তিনি একখানি বড় জোর বারো ইঞ্চি ইষ্টকের মত পাহাড়ের গাত্রে সংলগ্ন পাথর ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। বন্ধু বহু কষ্টে সেই কাঁর্ণিসের মত পাথরের উপর উঠিয়া কোন প্রকারে উপরের পাহাড়ে আরোহণ করিলেন। আমি অকূল সমুদ্রে পড়িলাম। তাহার ও আমার মধ্যে একটা ব্যবধান আসিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন “দাঁড়ান মশায়, আমি আগে দেখিয়া আসি, কোন পথ আছে কি না। শেষে কি দুইজনেই বিপদে পড়িব।” আমি নিস্তব্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দুই তিন মিনিট অতীত হইল, তাহার কোনও সংবাদ নাই।

গভীর অন্ধকার রজনীতে পথভ্রান্ত পথিক সহসা আলো পাইলে বেক্ষপ উল্লসিত হয়, বন্ধুবর যখন ডাকিয়া বলিলেন “আম্নন একটা পথ পাওয়া গিয়াছে” তখন আমারও অনেকটা সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

বহুকষ্টে পাহাড়ের গাত্র বহিয়া বন্ধুবরের সাহায্যে অনেকটা উপরে উঠিলাম, কিন্তু পরিধেয় বস্ত্রখানি ছিঁড়িয়া গেল, পায়ের ও হাতের তিন চারি স্থানের চৰ্ম্ম উঠিয়া গিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। সৰ্ম্মশরীর কাঁপিল, তালু শুষ্ক হওয়াতে পিপাসায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল; আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া পড়িলাম। নিকটবর্তী একটা অল্পবিস্তৃত সমতল পাহাড়ের উপর দেখি একজন পাহাড়ী লালল দিতেছে। এখানে এই নিত্য-অভ্যস্ত দৃশ্যটি বড়ই অভিনব দেখাইতে লাগিল। যাহা কতদিন চক্ষে পড়িয়াছে, কিন্তু

হৃদয়ের মধ্যে একটি রেখাপাতও করিতে পারে নাই, আজ এই সুদূর পার্শ্বত্যাগ প্রদেশের নিস্তর প্রকৃতির মধ্যে তাহা যেন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত দেখাইতে লাগিল, তাহার দিক হইতে নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হইল না ।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জলের অবশেষে উক্ত ব্যক্তির নিকট উপনীত হইলাম। সে আমাদের দেখিয়া লাঙ্গল হস্তে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিলাম সে সামান্য একখণ্ড ভূমি কর্ষণ করিতেছে। এতদূর আসিয়াছি, কিন্তু কোথাও মৃত্তিকা দেখিতে পাই নাই! এখানে কেমন করিয়া এইটুকু ভূমি পাথর না হইয়া রহিয়াছে তাহা বুঝিলাম না। সে আমাদের নিকটবর্তী বরণা দেখাইয়া দিল। তাহার সহিত দুই একটি কথা কহিয়া অবগত হইলাম যে, অল্পদূরেই তাহার কুটীর। যে পথ দিয়া আমরা উপরে আরোহণ করিব সেই পথের পাশেই তাহার ক্ষুদ্র কুটীর পরিলক্ষিত হইবে।

সেই পথ ধরিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। সে ব্যক্তি বলিল “আপনারা যে পথে আসিয়াছেন, ওপথে কেহ পাহাড়ে উঠিতে সাহস করে না।” আমাদের দুঃসাহসিকতা তাহার নিকট নির্ভীকতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইল।

অল্পদূর আসিতেই একটি বরণা দৃষ্টিগোচর হইল! অঞ্জলি পুরিয়া শিখবারি মুখে চোখে প্রদান করিলাম এবং আকণ্ঠ পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম।

এবার পথের দিকে খুব দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে কোন কারণে যদি শুষ্ক পত্রের মর্মমর্ম শব্দ হয়, অমনি আতঙ্কে চারিদিকে চাহিয়া দেখি। আরম্ভের উৎসাহ শেষে আতঙ্কে আশঙ্কার পরিণত হইতে লাগিল। একটি উচ্চ পর্বত হইতে এইখানে পথটি

নাচু দিকে নামিয়াছে, পথ বড়ই ঢালু, খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া যাইতে হয়; কোন গতিকে পদস্থলন হইলে আর নিস্তার নাই। এইখানে দুই তিন খানি ক্ষুদ্র কুটীর নয়নগোচর হইল। মনে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল। এই কুটীরগুলির সৌন্দর্য্য এই নিরালয় পর্ব্বত-প্রদেশে যেন চিত্রকরের নিপুণ তুলিকার কোমল করুণ আঘাত বলিয়া মনে হইতেছিল। কুটীরের দ্বারদেশে দুইটা বালিকা ও একটা বালক খেলা করিতেছিল; কেহ পাথরের উপর পাথর দিয়া খেলাঘরের পর্ব্বত নিষ্কাণ করিতেছিল, কেহ সঙ্গীর চেষ্ঠাকে বিকল ও ধর্ম্ম করিতে অনেকগুলি বড় বড় শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া একটা বড় পাহাড় প্রান্তের প্রয়াস পাইতেছিল। ইহাদের খেলাতেও বিশেষত্ব আছে।

আমাদিগকে সেই বিজনপ্রদেশে আসিতে দেখিয়া তাহারা খেলা ছাড়িয়া শিলাগুলি ছড়াইয়া উঠিল। একটা বালিকা ছুটিয়া গিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল। হলস্থল ব্যাপার পড়িয়া গেল। তিন খানি কুটীর যেন চঞ্চল ও মুখর হইয়া পড়িল! রমণীরা পর্য্যন্ত ছুটিয়া কুটীরের বহির্দেশে আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। সেই লাঙ্গলধারী ব্যক্তির কথা মনে পড়িল। ইহার মধ্যে একখানি কুটীরই তাহার শান্তি-নিকেতন, সেখানে আসিয়া সারাদিনের ক্লান্তিকাতর দেহভার ঢালিয়া সে বিশ্রামের আনন্দ উপভোগ করে।

একটা বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম “ষ্টেশন কোন্ দিকে?” অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাহাদের কুটীরের পশ্চাৎ দিক্ দিয়া যে সঙ্গীর্ণ পথটী আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, সে তাহাই দেখাইয়া দিল। আমরা আবার চলিতে শুরু করিলাম; অনেক দূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু রেল লাইন বা ষ্টেশনের কোন চিহ্নই দেখিলাম না। আশঙ্কা

হইল আবার কি পথ হারাইলাম। ভয়ে নানাপ্রকার বিপদের
মুর্তিমতী হইয়া নয়নের সমক্ষে ফিরিতে লাগিল, শরীর যেন ক্রমশই
শিথিল ও অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল; অথচ কোন উপায় নাই।
নিকটে গ্রাম নাই, লোকালয় নাই, দোকান পসার ত দূরের কথা।

কিছুক্ষণ এইরূপ আন্দোলিত অন্তঃকরণে চলিয়াছি, সহসা বন্ধুর
চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল “ঐ স্টেশন দেখা গিয়াছে।” উল্লাস
রাখিবার স্থান রহিল না; ছুটিয়া বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলাম।

দূর হইতে এই স্টেশনটিকে একখানি অঙ্কিত চিত্রের মত
দেখাইল। খুব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম, অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই
স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। স্টেশন ঘরটি কাঠের নিশ্চিত—
কপাট জানালা কাচের। গৃহের ছাদটির দুইদিক ঢালু, মধ্যখানটি
উঁচু। বরফ জমিবার ভয়ে এইরূপ গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। কাহারও
সাড়া শব্দ নাই। চারিদিকে সোমাহীন গিরিমালা, মধ্যে স্টেশন। কাচের
ভিতর দিয়া গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিনিষ্কপ করিতেই দেখিলাম—একজন
পাঞ্জাবী কর্ণ করিতেছেন। কাচের উপর আঙ্গুলের টোকা মারিতেই
তিনি দ্বার উদঘাটন পূর্বক বাহিরে আসিয়া বিস্ময়বিষ্কারিত নয়নে
আমাদের আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইলেন। ইংরাজীতে
জিজ্ঞাসা করিলেন—

“আপনারা দেখিতেছি বাঙ্গালী! কেমন করিয়া এখানে
আসিলেন—”

“এই পাহাড়পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি। এটি কোন স্টেশন?”

তিনি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন “গোমন”।

“টাকশাল কি ইহার আগের স্টেশনের নাম?”

লোকটা আরও একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন

“আপনারা কি কাল্কা হইতে হাঁটিয়া আসিতেছেন, টাঁকশাল ত
পথে ফেলিয়া আসিয়াছেন! টাঁকশাল হইতে গোমন পাঁচ মাইল
দূর।”

শুনিয়া ত নির্ঝাক্! কিছুক্ষণ পরে বলিলাম “মহাশয়, এখান
হইতে কাল্কা ফিরিবার গাড়ি কখন?” তিনি উত্তর করিলেন
“গাড়ি এখানে ধরে না। আস্ত্রন ঘরের মধ্যে গিয়া কথোপকথন করি,
বহুদিন পরে কথা কহিবীর লোক পাইয়াছি।”

বন্ধু বলিলেন “বাহিরে বেশ বাতাস বহিতেছে, এখানেই একটু
বিশ্রাম করা যাক্।”

তিনি ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন “না না, তাহা হইতে পারে না,
এখনই বাঘ আসিতে পারে।”

“সে কি” বলিয়া আমি চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম,
বলিলাম “এ পাহাড়ে বাঘ আছে নাকি?”

“ভিতরে বসিবেন চলুন। দেখিতে পাইবেন বাঘ ঐ নিম্নের
ঝরণায় জল পান করিতে আসিবে। আমাদের ষ্টেশনে ত মাঝে মাঝে
আসিয়া দরজায় জানালায় আঘাত করিয়া যায়।” তাড়াতাড়ি
ঘরের ভিতর গিয়া উপবেশন করিলাম।

এই ভদ্রলোকটি এখানকার Asst. Station Master, তিনি
আমাদের বিশেষ খাতির ও যত্ন করিলেন। ষ্টেশনমাষ্টার একজন
বান্দালী, একবৎসর হইল তিনি এই কৰ্ম উপলক্ষে এখানে আছেন
আমাদের আগমনবাস্তা যখন তিনি জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার
আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখন আহাৰ করিতে গিয়াছিলেন।
একজন pointsmanকে দিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠান হইল!
অল্পক্ষণ পরেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন! আমাদের দেখিয়া

তাঁহার মুখের উপর আনন্দদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল । তাঁহার মত ভদ্রলোক খুব কম দেখিয়াছি ।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি । তিনি জাতিতে কায়স্থ । শুনলাম, তাঁহার বাড়ী হুগলী জেলার মধ্যে তারকেশ্বরের নিকট হরিপাল গ্রামে । বেচারী ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশত্যাগী । আজ দুই বৎসর তিনি দেশে যান নাই । তাঁহার বর্তমান আকৃতি দেখিলে মোটেই মনে হয় না যে, তিনি কোন দিন দূরন্ত ম্যালেরিয়ার কবলে পতিত হইয়াছিলেন । তিনি বলিলেন, এই দুই বৎসরে তাঁহার নূতন জীবন লাভ হইয়াছে ; এক দিনের জ্ঞাও কোনরূপ অসুখ হয় নাই, তবে স্বদেশবাসীর সহবাস হইতে বঞ্চিত আছেন বলিয়া তাঁহার দুঃখ ।

বহুদিন পরে বাঙ্গালীর সঙ্গলাভ তাহার নিকট বেশ একটা অভিনব আনিয়া দিল । আমরাও অসহায় অবস্থায় তাঁহাকে দেবতার আশীর্বাদের মত পাইয়া যে কি পর্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিলাম তাহার স্বরূপ বর্ণনা দুরাকাজ্ঞা ।

দেশ যতই কুৎসিত হউক, যতই অশান্তিকর হউক, যতই অমঙ্গলকর হউক, তবুও দেশের জ্ঞা কেমন একটা “টান” অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই প্রবাসী ভদ্রলোকের প্রতি কথায়, প্রতি প্রশ্নের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল । আমাদের নিবাস কোথায়, কোথায় আসিয়াছি, কয়দিন থাকিব, এখানে কেমন করিয়া আসিলাম, এ বৎসর ও দিকে ম্যালেরিয়া কিরূপ, তাঁহাদের গ্রামের কোন খবর রাখি কি না, প্রভৃতি উপযুক্ত প্রশ্নমালায় তিনি আমাদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । আমরাও যতদূর সম্ভব উত্তর দিয়া ভদ্রলোককে সুখী করিতে প্রয়াস পাইলাম ।

অল্পক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, “অপরাধ মাপ্ করবেন, আপনাদের পেয়ে এত আনন্দ হয়েছে যে তা আর মুখে বলতে পারি না। আপনাদের আহারাদি ব্যবস্থা করবার কথা পর্য্যন্ত ভুলে গেছি।” এই বলিয়া তিনি ছুটিয়া গৃহের বাহিরে গেলেন, তার পর কি ভাবিয়া পুনরাগমন করিলেন। আজ যেন তাঁহার বহুদিনের রুদ্ধ কথার স্রোত ছুটিয়াছে, অনর্গল কথা কহাতেই আজ যেন তাঁহার তৃপ্তি!

তিনি বলিলেন, “দেখুন—এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। কোন প্রকারে একবেলা একমুঠা আলোচালের ভাত আর একবেলা খানকতক রুটি আহার ক’রে দিন কাটাচ্ছি—আপনাদের যে কি খেতে দেব তাই ভেবে অস্থির। মশাই, দুঃখের কথা কি বলব, এক পয়সার চিনির প্রয়োজন হোলে কাল্‌কায় লোক পাঠান ভিন্ন অণ্ড উপায় নাই।”

আমি বলিলাম “আপনি আমাদের জন্ত ব্যস্ত হবেন না, আমাদের আহারাদির প্রয়োজন নাই। এখন কেমন ক’রে কাল্‌কায় ফিরে যেতে পারি তার একটা উপায় করুন। আমাদের আজই কাল্‌কায় ফেরা বিশেষ আবশ্যক।”

তিনি বলিলেন “এখানে ত গাড়ী ধরে না।”

তবে উপায়? আমার বন্ধু ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আমার মনে দারুণ আশঙ্কা হইল। যে পথে আসিয়াছি যদি সেই পথে পুনরায় ফিরিতে হয় তবে ত ফেরার পক্ষে বিশেষ সন্দেহ। একবার ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া লইলাম। সেই নীল মেঘরাজির মত গিরিশ্রেণী; যেন মেঘ আর গিরি ছাড়া এ বিশ্ব-সংসারে আর কিছুই নাই।

তিনি আমাদের বিষম মুখ দেখিয়া বলিলেন “ভাবনা নাই।

বেলা পাঁচটার সময় একখানা গাড়ি কাল্কা অভিমুখে যায়, যাতে সেটা এখানে থামে, তার জন্ত এখনি তার করছি ।”

তারপর তিনি দুই মিনিটকাল টেবিলে বসিয়া টক্ টক্ শব্দ করিতে লাগিলেন। আমরা শঙ্কিত অন্তরে বিচারপ্রার্থী আসামীর জায় নিশ্চল ভাবে উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। যদিও সাঙ্কেতিক শব্দের মর্শ্ব আমরা বিন্দু বিসর্গ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তথাপি মনে হইতেছিল এইবার যে ঘন ঘন দুইটি টক্ টক্ শব্দ হইল, উহার অর্থ “থামিবে! থামিবে!!” কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল—এখানে কখনও গাড়ী দাঁড়ায় না, আজ কেন আমাদের মত অজ্ঞাত সামান্য দুই জন বাঙ্গালীর জন্ত থামিবে?

ঠিক এই সময় ভদ্রলোক চেষ্টারখানি সজোরে পশ্চাতে ঠেলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন “গাড়ী থামিবে, কোন চিন্তা নাই।” ইহাতে আমাদের অপেক্ষা তাঁহার যেন অধিক আনন্দ হইল। তিনি আবার বলিলেন “বড় কষ্ট যে, আপনাদের পাইয়া কোনরূপ সমাদর বা অভ্যর্থনা করা দূরে থাক, ক্ষুধা নিবৃত্তির মত এমন কিছুই নাই যাহা দিতে পারি।” আমরা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম “সে জন্ত কিছু মনে করিবেন না। আপনার আগ্রহের মধ্যে যে অভ্যর্থনা ও বস্ত্র তাহার তুলনায় খাওয়া বড় বেশী ব’লে মনে হয় না।” তবু সে কথা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। আমরা আহ্বারাদির প্রতি অমনোযোগিতা প্রকাশ করিয়া গাড়ী কখন আসিবে, এই প্রশ্ন করিতেছিলাম তিনি বলিলেন “সে জন্ত কোন ভাবনা নাই।” দুর্ভাবনার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া, স্নান করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল।

যতক্ষণ কেমন করিয়া কাল্কা ফিরিব এই চিন্তা মনে ছিল, ততক্ষণ স্নানহারের কথা কিছুই মনে স্থান পায় নাই। স্নানের কথা শুনিয়া ভদ্রলোক বলিলেন “জল আনাইয়া দিতেছি, এখানেই স্নান করুন, ঝরণার কাছে এখন আর গিয়ে কাজ নাই।”

“ঝরণা এখান হ’তে কতদূর।”

“বেশী দূর নয় ; নিকটেই—ঐ নিয়ের পাহাড়ে। জল অতি স্বচ্ছ ও নির্মল। এরূপ জল শুনিয়াছি এ অঞ্চলে কোথাও নাই।”

Pointsman, পোর্টার প্রভৃতি দুই তিন জন লোককে লইয়া তিনি নিজে আমাকে স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। জল অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। তারপর তিনি বাসা হইতে খানিকটা চিনি আনাইয়া সরবত প্রস্তুত করিয়া দিলেন। উহা পান করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিলাম।

স্নানান্তে যখন আমরা স্টেশনের বারাণ্ডায় একখানি খাটিয়ার উপর বসিয়া গল্প করিতেছি, তখন মাঝে মাঝে সচকিত দৃষ্টিতে চতুর্দিক দেখিতেছিলাম, পাছে সেই ভয়ানক জন্তুটি কখন কোন্ দিক দিয়া আসিয়া টপ্ করিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া যায়।

এমন সময় দেখি সম্মুখস্থ পাহাড় হইতে সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কতকগুলি জ্বালানি কাঠ মাথায় করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার হস্তে একখানি কুড়ুল। আমাদের নিকটবর্তী হইয়া তিনি যুহু যুহু হাসিতে লাগিলেন ; খুব কাছাকাছি আসিয়া বলিলেন—

“আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে অসভ্য জঙ্গলী বিবেচনা করছেন। আপনাদের দেশে কোন ভদ্রলোক এরূপ ভাবে বোঝা মাথায় করিয়া কখন আনেন না, বা আনিতে পারেন না।”

আমরা বলিলাম “না না, ও কথা বলবেন না, নিজের কাজ নিজে করি না বলেই ত আমাদের এত অবনতি, এত অধঃপতন হ’য়েছে।”

এই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির মুখে সদাসৰ্বদা হাসি লাগিয়াই আছে। তিনি উত্তর করিলেন, “দেখুন, এখানে দোকান-পসার নেই, লোকজন নেই, নিজে কাঠ সংগ্রহ না করলে কে ক’রে দিবে বলুন? Points-man, পোটার বাঘের ভয়ে কেহ উঁচু পাহাড়ে গিয়া কাঠ কাটিতে সাহস করে না। আমি তাহাদের বলিতেও ইচ্ছা করি না।”

তিনি কাঠের বোঝাটি মাথায় করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, যেন তাঁহার কোন রূপ কষ্ট বা ভার বোধ হয় নাই। তাঁহার সেই সরল সহজ শান্ত দৃষ্টিতে বিপুল মনের বল প্রকাশ পাইতেছিল; তাঁহার কথাবার্তায়, হাসিতে, চাহনিতে বেশ কেমন একটা মনুষ্যত্বের নিরহঙ্কার ভাব আমাদের সঙ্কীর্ণ সভ্যতা-ভিম্বানী মনের উপর তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিতেছিল।

আমরা বেশ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলাম “ইহাতে লজ্জার কথা কিছুই নাই। বরং গৌরব করিবার কথা—বাঘের মুখ হইতে কাঠ কাটিয়া আনেন।”

তিনি বলিলেন, “এখনি আপনাদের নিকট আসছি, কাঠগুলি দিয়া আসি, নইলে হয় ত রন্ধন বন্ধ যাবে, কিছু মনে করবেন না।”

দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তিনি হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় আমি অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক কতকগুলি গিরিস্তরের পর একটা গগনস্পর্শী গিরিশিরস্থ শুভ্রসুপ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “উহা কি?”

তিনি ভক্তিপরিপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—“দেবীর মন্দির”।

এই নিরালয় নির্জন পর্বতপ্রদেশের মধ্যে কে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিল ! কে ঐ মানব-আবাস-পরিশূন্য ব্যাঘ্র-ভল্লুক-ভয়-সঙ্কুল স্থানে পূজার্থে দেবীর মন্দির নির্মাণ করাইল ! কত কথাই মনে আসিতেছিল । সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা ভক্তির অনাবিল স্রোত হৃদয়ের পরতে পরতে প্রবাহিত হইতে লাগিল ।

আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম “বলুন, আমাদিগকে দেবী দর্শন করাইয়া আনিবেন ।”

তিনি বলিলেন “কিছু দিন তবে এখানে থাকুন, এক দিনে ত যাওয়া যাবে না । যদি দুই একটা সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ হয় তবে যাওয়া যায়, আমি ত পথ চিনি না ।”

“ওখানে কুরা থাকে ?”

“তাহারা পার্শ্বত্যাগী, নীচে বড় আসে না । তাহাদের অভাব ওখানেই পূরণ হয় ; নীচের কোন সংবাদ বোধ হয় তারা জানেনা ।”

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন, “বলেন কি, ও যে গুনেছি দুই দিনের পথ । তার পর বাঘভাল্লুকের হাত থেকে নিস্তার পেলে ত দেবী ; দর্শন আমার মাথায় থাকুক, আমি এখান হ’তেই আজ দুই বৎসর তাঁকে প্রণাম করে আসছি । ধন্য আপনাদের সাহস ।” পাঞ্জাবী হাসিয়া বলিলেন “সত্যি ঐখানে পৌঁছিতে দুই দিন লাগে, এখান হ’তে অনেক দূর, তারপর, পাহাড়ের পথ চিনিয়া যাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার ।”

আমি বলিলাম “ঐহারা পর্বতে বাস করেন, তাঁহাদের নিকট আর শক্তি কি ?”

“না মহাশয় ও কথা বলবেন না । আমার জন্ম এই পাহাড়ে, আমার চাকরীও এই পাহাড়ে, তথাপি আজ জোর ক’রে বলতে পারি

না যে, পাহাড়ের যতটুকু স্থান আমার জানা আছে, তাহার পথগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পেরেছি। দেখুন না কেন, আজ খানিক পূর্বে এই সামনের পাহাড়ে এক বোকা কাঠ কেটে রেখে এসেছিলাম, কিন্তু আনতে গিয়ে আর খুঁজে পাইনি। এখানে অথ কেহ নাই, যে মনে করবেন, কাঠগুলি আর কেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। এই পথটি ভালো ক'রে জানা আছে, এ গর্ব করবার কারো যো নাই।”

এই স্থান হইতেই আমরা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি কুড়ুল নিয়ে আবার কোথায় যাচ্ছেন!” তিনি বলিলেন “আরো কতকগুলি কাঠ কেটে রেখে আসতে। আপনারা কি আমার সঙ্গে উপরের পাহাড়ে উঠিবেন। চলুন না, বেশ সুন্দর একটা ঝরণা আছে দেখবেন, নানা ফলের ও ফুলের গাছ আছে, কেমন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অসংখ্য পথ।”

তখন দুই বন্ধুতে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। তারপর ষ্টেশনমাষ্টারের প্রতি সোৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইলাম, তিনি বলিলেন, “গাড়ি আসতে অনেক বিলম্ব আছে। দেখেই আসুন না কেন।”

আমাদের অগ্রে অগ্রে পাঞ্জাবী কুড়ুল হস্তে, ছরন্ত বালকের মত সেই উঁচু নীচু পথ অবলম্বনে বেশ সহজে ছুটিয়া উঠিতে শুরু করিলেন। আমরা তাহার অনুসরণ করিয়া কেবলই পিছাইয়া পড়িতেছি দেখিয়া, তিনি মাঝে মাঝে দাঁড়ান, আর জিজ্ঞাসা করেন “বড় কষ্ট হচ্ছে কি? ধীরে ধীরে উঠিলে শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, আমার মত ছুটিয়া ছুটিয়া উঠুন বেশ আহ্বাদ পাবেন, কোন কষ্ট হবে না।”

আমরা তাহাই করিতে লাগিলাম; তবে আশঙ্কা যথেষ্ট হইতেছিল, পাছে পড়িয়া যাই!

চারিদিকে কেবল পথ, আর জঙ্গল ! যতই উপরে উঠিতেছি, ততই মনে হইতেছে আমরা যে পর্বতে ছিলাম, সেইখানেই আছি। পাহাড়গুলি যেন যমজ ভ্রাতা। একটীকে দেখিয়া অপরটিকে ভ্রম হয়। পাহাড়ের উপর নানা জাতীয় বৃক্ষলতা, কোথাও বৃক্ষে পরিপূর্ণ ফুল হইয়াছে, কোথাও টেপারির মত একজাতীয় ফল মুক্তার ন্যায় রৌদ্রকিরণে ঝিকিমিকি করিতেছে—কোথাও পর্যাপ্ত পরিমাণে নাসপাতি ফলিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা ঝরণার তুষারশীতল, ক্ষটিকস্বচ্ছ বারিরাশি ঝর ঝর করিয়া চলিয়াছে, কোনো কোনো স্থানে বিবিধজাতীয় পার্কত্য কুমুম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, থাকিয়া থাকিয়া নানা বিহগের কূজন শ্রুতিগোচর হইতেছে—আমরা মুগ্ধ হৃদয়ে এই সৌন্দর্য-বতায় ভাসিয়া চলিয়াছি—আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে। তখন পাঞ্জাবী আমাদের প্রতি ভক্তি-উজ্জ্বল-নয়নে তাকাইয়া বলিলেন “বলুন ত মহাশয়, এ সব কাহাদের জন্ত রহিয়াছে? এত ফুল অরণ্যে ফুটিয়া অরণ্যেই ঝরিয়া বাইতেছে—এত ফল অকারণ শুকাইয়া নষ্ট হইতেছে, ইহার কি কোন সার্থকতা নাই? অবশ্য আছে—বিশ্বনিয়ন্তার প্রেমের রাজ্যে অপ্রেমের কিছুই নাই। দেখুন না কেন, পর্বতের চতুর্দিকে তরুলতা, কণ্টক বৃক্ষ, কিন্তু এই সকল সঙ্গীর্ণ পথগুলির উপর এক গাছিও কণ্টক দৃষ্ট হইতেছে না। কেহ যেন প্রতিদিন পথগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। যেখানে মনুষ্যসমাগম নাই সেখানকার রাস্তা কাহাদের জন্ত পরিষ্কার রহিয়াছে। কাহারো এই ভয়সঙ্কুল পথে হাঁটিয়া থাকেন।” বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর ভক্তি গদগদ হইয়া পড়িল। নয়ন পুলকাক্রান্ত হইল। তিনি নতজানু হইয়া সেই পথের উপর ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। তাহার পর বলিলেন “আমার মনে হয়, এই পথ দিয়া সা

সন্ন্যাসী গমনাগমন করিয়া থাকেন। পাছে তাঁহাদের চরণে কণ্টক বিদ্ধ হয়, পাছে তাঁহাদের চলিতে কষ্ট হয়, তাই ন্যায়াল ঠাকুর এই নির্জন পর্বতের পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাই তাঁহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত সুমিষ্ট ফল স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।”

এইবার তিনি আর একটা সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিলেন। অল্প দূর অগ্রসর হইবার পর সে পথে পাশাপাশি বাওয়া চলিল না। পথ ক্রমেই অল্পপরিসর হইয়া আসিল। তখন পাঞ্জাবী সর্বাঙ্গে রহিলেন, তাঁহার পশ্চাতে আমি ও আমার পশ্চাতে ‘উপেন সাহেব।’ এইবার যে স্থানটিতে উপস্থিত হইলাম সেখান হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে মস্তক ঘুরিতে থাকে—আশঙ্কায় বক্ষের শোণিত শুষ্ক হইয়া আসে। চারিদিকে কেবল পাহাড়—এই গিরীশ্রেণীর শেষ নাই, সীমা নাই, সেখান হইতে পাহাড় ঢালুভাবে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে; নিম্নস্থ বৃক্ষলতাাদি বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায় না। পাঞ্জাবী নিম্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন, ঐ যে রৌদ্র-কিরণোজ্জ্বল শুভ্র-রজত-স্বত্রের মত একটা বক্র রেখা দেখিতে পাইতেছেন—উহা একটা গিরি-নির্ঝরিণী। অল্পক্ষণ এখানে দাঁড়াইল দেখিতে পাইবেন উহার তীরে নানা জাতীয় জন্তু আসিয়া জলপান করিবে। ঐ নদীর ধারে অনেক সময় সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন পাওয়া যায়—তাঁহারা স্নানাদি করিতে আগমন করেন। তখন চারিদিক হইতে বিহঙ্গ কূজন ও নানাবিধ অজ্ঞাত পুষ্পের গন্ধে চারিদিক মাতিয়া উঠিয়াছিল। মনের ভিতর যেন একটা অজানা আনন্দের বহা বহিতেছিল; মনে হইতেছিল চারিদিকের শোভা সৌন্দর্যের মধ্যে যেন আত্মহারা হইতেছি—সুখ বুঝি ইহারই নাম; কবির কথা মনে জাগিয়া উঠে—

“তরী হতে সন্মুখেতে দেখি দুই পার ;
 স্বচ্ছতম নীলাম্বের নিখিল বিস্তার ;
 মধ্যাহ্ন আলোকপ্লাবে জল স্থলে বনে
 বিচিত্র বর্ণের রেখা ; আতপ্ত পবনে
 তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি’
 আশ্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি’ রহি’
 বিহঙ্গের শান্তি স্বর ।

* * * *

বিশ্ব-বীণা হতে উঠি’ গানের মতন
 রেখেছে নিমগ্ন করি নিখর গগন ;
 সে সঙ্গীত কি ছন্দে গাঁথিব ; কি করিয়া
 শুনাইব, কি সহজ ভাষায় ধরিয়া
 দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে,
 রেখে দিব ফুটাইয়া কি হাসি আকারে
 নয়নে অধরে, কি প্রেমে জীবনে তারে
 করিব বিকাশ ?’ সহজ আনন্দ খানি
 কেমনে সহজে তারে তুলে ধরে আনি
 প্রফুল্ল সরস ?

* * * *

চারিদিকে

দেখে’ আজি পূর্ণ প্রাণে মুগ্ধ অনিমিষে
 এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
 মনে হ’ল সুখ অতি সহজ সরল ।

ভক্তের চক্ষে সকলি সুন্দর ! সকলি অপার্থিব ! পাঞ্জাবীর সেই

ভক্তি-উজ্জ্বল নয়ন, আনন্দদীপ্ত আনন, স্মৃতিষ্ট বচন, আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই ।

পাহাড়ের নানাস্থান প্রদর্শন করাইয়া শেষে গাড়ীর শব্দ শুনিলে আমাদের লইয়া তিনি নামিয়া নীচে আসিলেন । গাড়ী আমাদের জন্ত গোমনে ধরিল । বেলা সাড়ে ছয়টার সময় তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কাল্‌কায় ফিরিলাম ।

যখন গোমন হইতে গাড়ী ছাড়ে তখন বান্ধালী ভদ্রলোকটির মুখ বিষম হইয়া গেল । তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন “পত্র লিখিবেন ।” আমরা যেন তাঁহার কতই পরিচিত, কতই আপনার জন । সঙ্গীতের শেষ রেশের ন্যায় সেই ভক্ত পাঞ্জাবীর কথাগুলি আজও যেন কাণের কাছে ধ্বনিত হইতে থাকে—“ভগবানের রাজ্য দেখিয়া গেলেন, বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট তাঁহার অপরিসীম দয়ার কথা বলিতে বিস্মৃত হইবেন না ।” আজ যতদূর সাধ্য তাহারই বর্ণনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম ।

বালেশ্বরে আট দিন ।

সারাদিন যাত্রার বেগাড়া চলিতেছে । বিছানাপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কুচান সুপারী পর্য্যন্ত ট্রাঙ্কে ভরা হইয়াছে । দশ দিনের ছুটিতে বেড়াইতে যাওয়া হইবে বলিয়াই এই বিপুল আয়োজন ।

সন্ধ্যার ক্ষণপূর্বে গৃহিণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কোথায় যাওয়া স্থির হইল ?” আমি তখন ভাবিতেছিলাম হয় ত যাহা লওয়া বিশেষ আবশ্যক ছিল তাহা গ্রহণ করা হয় নাই, আর যাহা মোটেই না লইলে চলিত, তাহাই বিশেষ যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়াছি ।

গৃহিণীর মুখের দিকে না চাহিয়াই উত্তর করিলাম “এখনো কিছু ঠিক করিতে পারি নাই, দেখা যাক কোথায় গিয়া ঠেকি ।”

সন্ধ্যার অল্প পরেই সঙ্গী মণিবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি একেবারে গাড়ী করিয়া আসিয়াছিলেন । আশ্বিন মাস । সমস্ত দিন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হইতেছিল । তাহাতে উৎসাহ কতকটা মন্দীভূত হইয়াছিল ।

গাড়ীতে উঠিয়াই মণিবাবু বলিলেন “তারপর কোথায় যাওয়া স্থির করিলেন ?” আমি বলিলাম “কোন জায়গা ত মনোনীত করিতে পারি নাই, আপনি একটা ঠিক করুন ।”

আমাদের সঙ্গে দুইখানি Time table ছিল, একখানি B. N. Ry.,র অপর খানি E. I. Ry.র ; কারণ কোথায় যাওয়া হইবে, তাহার স্থিরতা ছিল না । নানা কথা ভাবিতেছি এমন সময় গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল । প্ল্যাটফরমে নামিয়া দেখি একখানি ট্রেন ছাড়িবার জন্ত প্রস্তুত রহিয়াছে । তখন নূতন ষ্টেশন নির্মিত হয় নাই—পুরাতনের আদর পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত । দুই লাইনের গাড়ী তখন এক ষ্টেশন হইতে ছাড়িত ।

অনুসন্ধান জানিলাম, গাড়ী পুরীর জন্ত রওনা হইবে । তাড়াতাড়ি স্থির হইল যেখানে গিয়া প্রভাত হইবে, ঊসই স্থানের টিকিট ক্রয় করিব ।

অতঃপর বালেশ্বরের দুইখানি টিকিট ক্রয় করা হইল । আমাদের আগ্রহ, উৎসাহ ও তৎপরতা অপেক্ষা রেলের কুলিগুলির তাড়া বেশী দেখিলাম ।

তাহারা আমাদের গাড়ীতে চড়াইয়া দুই পরসার স্থানে চারি আনা আদায় করিয়া অল্প শিকার অবশেষে ছুটিল । আমরা যে গাড়ীতে যাত্রা করিলাম সেখানি Madras মেল । গাড়ী বংশীধ্বনি করিয়া ছাড়িয়া দিল । তৃতীয় শ্রেণীর আহোরীগণ সমস্তরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—“জয় জগন্নাথ প্রভু কি জয় !”

আমরা যে বৎসর যাই, তাহার দুই বৎসর পূর্বে এই লাইন খোলা হইয়াছে । বন্ধু বিছানা-পত্র পাতিয়া সব ঠিক ঠাক্ করিয়া লইলেন । আমি একটি জানালার ধারে গিয়া উপবেশন করিলাম । এ পথে ইহার পূর্বে আর কখন আসি নাই, সূতরাং আমার আনন্দ ও আগ্রহ প্রথম হইতে বেশ পরিলক্ষিত হইতেছিল । মণিবাবুর মেদিনীপুর পর্য্যন্ত দেখা ছিল, তিনি অপর একটি মেদিনীপুর যাত্রী আরোহীর সহিত তাহার মেদিনীপুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লইয়া বেশ আসর জমকাইতে ছিলেন ।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী দ্রুত দানোদরের পোল অতিক্রম করিল ! যে দানোদরের খরশ্রোতে একটি কুটা পড়িলে একদিন দ্বিধা হইয়া যাইত, আজ তাহার বন্ধন-দশা অবলোকন করিয়া নানা কথা মনে পড়িল । দানোদর নদের উপরকার পোলটি প্রায় দীর্ঘে অর্ধ মাইল বিস্তৃত হইবে ।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ীর গতি কিছু হ্রাস হইল । মুখ বাড়াইয়া

ব্যাপার কি দেখিতেছি এমন সময় সঙ্গী বন্ধু বলিলেন “দেখিতেছি তুমি আজ সারারাত্রি ঘুমাইকে না। ঘুমাইতেও দিবে না, এখানে লিপিবদ্ধ করিবার কিছু নাই ; বরং এইবার রূপনারায়ণের পোল আসিতেছে ; এটা অবশ্য দেখিবার মত !” তারপর গাড়ি রূপনারায়ণের পোলের উপর উঠিল—গম্ গম্ শব্দে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে—নিম্নে শৃঙ্খলাবদ্ধ নদী পড়িয়া রহিয়াছে—বাঁধন ভাঙ্গিবার জন্ত সুদৃঢ় স্তম্ভগুলির গাত্রে রখা তরঙ্গাঘাত করিতেছে। প্রতিহত তরঙ্গাঘাতের শব্দ জলকল্লোলের সহিত শুনা যাইতেছিল।

রূপনারায়ণের পরপারেই কোলাঘাট। এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া ধীর করিয়া তমলুক যাইতে হয়। এই জন্ত মেল এই সামান্য স্টেশনে থামে। গাড়ি থামিলে অনেকগুলি যাত্রী অবতরণ করিল। ‘ডাব চাই’ ‘মুড়ি বাবু, গরম মুড়ি চাই’ বলিয়া বিক্রেতা গাড়ীর কাছে ডাকিয়া গেল। সেই রাত্রে অনেকে পথের আহাৰ্য্য স্বরূপ তাহাই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

ই, আই, রেলের স্টেশনগুলিকে আমি বড় ভালবাসি। দিন নাই, ছপুর নাই, রাত্রি নাই, সন্ধ্যা নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই—সব সময় সেই এক বনিয়াদি চাল “চাই পুরী-মেঠাই, মালাই, গরম দুধ—আপেল, পেয়ারা—নাসপাতি, চা।” শুনিতে বেশ লাগে।

খড়্গপুর একটা প্রকাণ্ড স্টেশন ; এইখান হইতে নাগপুর, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের জন্ত গাড়ী বদল করিতে হয়। স্টেশনটি বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সূশোভিত। নানা দিক হইতে যাত্রী আসিয়া নানা দিকে চলিয়াছে। সে এক বিরাট ব্যাপার ; সকলেই নিজ নিজ দ্রব্যাদি ঘাড়ে, পিটে ও কুলীর মাথায় দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কেহ বা ছুটিয়া আসিয়া পুরী-যাত্রী আরোহীদের ব্যাকুলত্বের জিজ্ঞাসা

করিতেছে “মহাশয়, এই গাড়ী কি কলিকাতা যাইবে?” কেহ বা সন্দী হারাইয়া পাগলের মত হাঁকাহাঁকি জুড়িয়া দিয়াছে; কোথাও বা কাপড়ে গাঁট-ছড়া বাঁধিয়া একদল স্ত্রীলোক, মাত্র একটা নিরীহ পুরুষের তত্ত্বাবধানে গাড়ীর অন্তঃস্থানে, একবার এদিক, একবার ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যেন কলের পুতুলের মত নড়িতেছে, ফিরিতেছে। তাহাদের রক্ষক ও পথপ্রদর্শকও সেইরূপ। টিকিট কলেক্টার, কুলী, রেলওয়ের কর্মচারিবর্গ প্রবল প্রতাপে, গর্বিত-বন্ধে চলা-ফেরা করিতেছে। তাহারা যেন দেবতা, অনেক সাধ্য সাধনার পর যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে শত প্রশ্নের পর একটা উত্তর দিয়া থাকেন। চারিদিকে গোলমাল; কোথাও কাহার টিকিট-সহযাত্রীর নিকট ছিল, কিন্তু সে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া যাওয়ায় টিকিট দেখাইতে পারিতেছে না বলিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করিবার ভয় প্রদর্শিত হইতেছে, সে আকুল অন্তরে সহযাত্রীকে ডাকিতেছে এবং সে যে টিকিট কিনিয়াছিল এই সত্যের সমর্থনের জ্ঞাত আস-পাশের যাত্রীর সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে। এইখানে গাড়ী অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করে। মেদিনীপুর-যাত্রী ভদ্রলোকটি আমাদের ফিরিবার সময় বিরাট রাজার গো-গৃহ দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর মাঝে একটু বেশ নিদ্রা হইয়াছিল। পথে অত কিছু দেখিবার অবসর হয় নাই।

ভোরের সময় গাড়ি বালেধরে গিয়া পৌঁছিল। তখনও উষার আলো অরুণবর্ণে রঞ্জিত হয় নাই। তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। বেশ একটু শীত শীত করিতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি কুয়াসার অবগুণ্ঠন টানিয়া প্রকৃতি

সতী যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অদূরে পর্বতশ্রেণী, নিবিড় নীরবতার মধ্যে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে চতুর্দিকে দৃষ্টিনিষ্কপ করিলে, প্রাণের ভিতরে বেশ একটু আনন্দের সঞ্চার হয়। চতুর্দিকে বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তরভূমি— অদূরে নীলগিরি। মাঝে মাঝে গাড়ীর বংশীধ্বনি সেই বিপুল নিস্তব্ধতার উপর কেমন এক মধুর ঝঙ্কার আনিয়া পুলক সঞ্চার করে। যখন ষ্টেশন হইতে যাত্রীরা যে যাহার গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল, কেবল রেলওয়ে কর্মচারী ও কেলনার কোম্পানীর খানসামাগণ ‘পিরিচ পেয়ালা’ লইয়া ছুটাছুটি শেষ করিয়া প্লাটফরমে পা ছড়াইয়া বসিয়া ধূমপানে কর্মস্রাস্তি দূর করিতে লাগিল, তখন কোথায় যাইব, সেই চিন্তায় আমরা বিব্রত। একটা উড়িয়া আমাদের মোটগুলি বহন করিবার অনুমতি প্রার্থনায় বিস্তর উমেদারী করিতেছিল। আগরা যতই তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম “তোকেই দিব, তুই বোস” সে ততই অধীর হইয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল “কোথায় যেতে হবে? মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাসায়?”

সেখানে কোন উকিলই আমাদের পরিচিত ছিল না। স্মৃতরাং তাহার কথায় আমার বড় রাগ হইল, শেষে বলিলাম “চল্ তোর মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাসায় যাই।” বন্ধু শুনিয়া উচ্চ হাস্ত করিয়া উঠিলেন, বলিলেন “সেই ভাল।”

উড়িয়া ইহাতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ভীতি-কাতর দৃষ্টিতে একবার আমার ও বন্ধুবরের মুখের প্রতি তাকাইতে লাগিল। এই সময় বেশ একটা উপজ্ঞাসের মতন ঘটনা সংঘটিত হইল। একটা ভদ্রলোক সেইখানে তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি চারিদিকে চাহিয়া কাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই

গাড়ীতে কাহারও আসিবার কথা ছিল, যেন তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছেন বোধ হইল। আমরা মনে মনে করিতেছি যে, ইহার নিকট হইতে একটা বাসার সন্ধান করিয়া লইতে হইবে, এমন সময়ে তিনি আসিয়া প্রশ্ন করিলেন “মহাশয় দেখিয়াছেন কি, দুইজন বাদ্দালী ভদ্রলোক আরোহী এই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াছে?” “আজ্ঞে না আমরা দুই জন ভিন্ন অন্য কোন বাদ্দালীকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে দেখি নাই।” বলিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম, কারণ এই আগন্তুক অন্য কেহ নয়, আমার সহপাঠী প্রসন্ন। প্রসন্ন তাড়াতাড়ি আগ্রহভরে আমার হাত, তাহার হাতের উপর টানিয়া লইয়া বলিল “মন নয় তুমি এখানে? কত দিন?” “এখনও দিন হয় নাই, ভোরেই আছি”—তারপর আমাদের অভিযান-ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বলিল “বেশ হইয়াছে এখন বাসায় চল।”

আমি বলিলাম “ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।”

উড়িয়া কুলিটি আমাদের একটা কিনারা হইল অবলোকন করিয়া ভারি খুসী হইল। ইঙ্গিত করিতেই সে সমস্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল।

বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে অল্প দূরেই নূতন বাজার—এইখানে প্রসন্ন বাসা লইয়াছে। তাহার বায়ু পরিবর্তন করিতে দুই সপ্তাহ হইল আসিয়াছে।

আহারাদির পর আমরা সহর দেখিতে বাহির হইলাম। এখানকার রাস্তা ঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেকগুলি বাজার আছে। সহরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কম নয়। বালেশ্বর কলিকাতা হইতে ১৪৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার সকল অধিবাসীই উড়িয়া, কিন্তু

তাহাদের চাল-চলন অনেকটা বাদ্দালীর মত হইয়া পড়িয়াছে। বেশীর ভাগ লোক গরীব। ইহাদের অনেকেই খৃষ্টধর্মাবলম্বী। এখানকার আদালত গৃহটি দেখিতে বড় সুন্দর, সম্মুখে একটা বিস্তৃত ময়দান। বড় বড় অশ্বখবৃক্ষরাজি চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া আছে। অদূরেই স্কুল। ম্যাজিষ্ট্রেটের আবাস গৃহটি বেশ সুরম্য। এখানে ইংরেজদের দুইটি উপাসনা-মন্দির আছে—একটা রোমান কৈথলিক ও অপরটি ব্যাপ্টিষ্ট।

বালেশ্বরের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। এখান হইতে সমুদ্র আট মাইল দূরে। সমস্ত দিন ঘুরিয়া অবসন্ন-দেহে ছয়টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এখানে চাউল বেশ সস্তা। নানাবিধ মৎস্য খুব সামান্য মূল্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ঝাড়েশ্বর শিব।

ঝাড়েশ্বরের মন্দির ষ্টেশন হইতে দশ মিনিটের পথ। এই মন্দির-স্থিত লিঙ্গসংক্রান্ত নানাবিধ কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন মহাদেব ঝাড়েশ্বর কাহারও প্রতিষ্ঠিত নন। তিনি পাতাল হইতে স্বয়ং উঠিয়াছেন। আমরা ঝাড়েশ্বর দর্শন করিবার জন্য বেলা সাতটার সময় বাসা হইতে বাহির হইলাম।

মন্দিরটা ইষ্টক-নির্মিত ও প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। পরিসরে ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। মন্দিরের সম্মুখে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী ইষ্টক-নির্মিত সোপানাবলী দ্বারাঃ পরিশোভিত, কিন্তু সংস্কারাভাবে নানাস্থান কালের কঠোর আঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। মন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দির যে এক সময় বেশ সুন্দর ও মনোরম ছিল তাহা তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া উপলব্ধি করা যায়। মন্দিরপ্রাঙ্গণের চতুঃসীমা প্রাচীরবেষ্টিত ছিল, তবে অনেক স্থানে প্রাচীরের ক্ষীণ রেখা

মাত্র অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দিরসংস্কার সম্বন্ধে কোন প্রকার উৎসাহ, অয়োজন বা চেষ্টা দেখিলাম না। নাটমন্দিরের নিকট দুই চারিটি গৃহ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ঐগুলি পূর্বের ঠাকুরের ভাড়া ও অতিথি অভ্যাগতের বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যেই পুরাতন অশ্বখ, বকুল, আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাদের সহিত যেন অতীতের অনেক পুরাতন গৌরবকাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। তাহারা একদিন ঝাড়েশ্বরের পূজা-অর্চনার সুখ-সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়াছে, শত শত প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ হইতে দেখিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে কালের নিদারুণ পরিবর্তনে তাহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত। দুই একজন সাধু-সন্ন্যাসী এখনও গাছতলায় ধূনি জ্বালাইয়া পড়িয়া থাকে ও ভজন গায়।

বেলা প্রায় ১০টার সময় স্নানাদি সমাপন করিয়া দেব-দর্শন করিতে মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। ধূপ-দীপাদির পবিত্র পূতগন্ধে স্থানটা ভূর-ভূর করিতেছিল। “শিব! শিব! বম্! বম্! হর! হর!” রব মন্দির অভ্যন্তরে ধ্বনিত হইতেছিল। পূজারী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বারবার মাথায় দুধ ঢালিতে ও বিশ্বপত্র প্রদান করিতে বলিলেন; এই সকল ব্যাপার হইতে প্রাণের ভিতর বেশ একটা ভক্তির ভাব আকুলতার সহিত জাগিতেছিল; কিয়ৎক্ষণের জন্ত বেশ একটু নির্মল আনন্দ ও শান্তির আশ্বাদ পাইলাম।

ঝাড়েশ্বরের পূজাদি সমাপন করিয়া বাসা অভিযুখে যাত্রা করিলাম। বহুদিন পরে দুইজন বাঙ্গালী ভক্তের অবির্তাবে পুরোহিত যতটা প্রসন্ন হইয়াছিলেন, বিদায়কালে আশাতীত দক্ষিণা পাইয়া তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সন্তুষ্ট হইলেন; এবং নানাবিধ অসম্ভব

আশীর্বাদ-বাণ নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে অতি সত্বর পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বাধ্য করিলেন।

ঝাড়েগরের মহাদেবের একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার মস্তকের উপর একটি ছিদ্র আছে, তাহাতে জল মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ অর্পণ করিলে তিনি হংসবৎ দুগ্ধের সারভাগ গ্রহণ করেন ও অসার জলভাগ বাহিরে ফেলিয়া দেন।

শিবরাত্রি উপলক্ষে এইখানে একটি মেলা বসে এবং নানাস্থান হইতে লোক-সমাগম হইয়া থাকে। এই মেলাটি দেবতার নামেই চলিয়া আসিতেছে।

বাসায় আসিয়া দেখি, আহাৰাদি সমস্তই প্রস্তুত—মধ্যাহ্ন-ভোজনটা বেশ সুচারুরূপেই নিষ্পন্ন হইল। বৈকালে বাজার দেখিতে বাহির হইলাম। এখানে সন্ধ্যার পর বাজার বসে, প্রচুর পরিমাণে মৎস্যাদি আমদানী হয়। এখানকার ধীবরেরা দিবাভাগে সমুদ্রে মাছ ধরে এবং সন্ধ্যার পর বাজারে, লইয়া আসে। এখান হইতে পমফ্রেট(Pumfret)নামক এক রকম সুস্বাদু সমুদ্রিক মৎস্য কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। ইহাদের সাহেব মহলে বড়ই আদর।

গোপীনাথ।

যাঁহারা পুরী তীর্থে গমন করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিম-মধ্যে বালেশ্বরে অবতরণ করিয়া গোপীনাথ দর্শন করেন। গোপীনাথ একটি প্রধান তীর্থস্থান। গোপীনাথ সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী শোনা যায়। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বলিয়া ভক্তদের মধ্যে ইহার বিশেষ খ্যাতি। বালেশ্বর হইতে আট মাইল উত্তরে গোপীনাথের মন্দির, পদব্রজে কিংবা গো-শকট সাহায্যে গমন করিতে হয়।

পরদিন রবিবার ভোর পাঁচটার সময় আমরা গোপীনাথ দর্শন করিতে রওনা হইলাম। পথটি বড়ই মনোরম। দুইদিকে বিস্তৃত শস্তপরিপূর্ণ ক্ষেত্র। সে দৃশ্যের তুলনা হয় না, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর বোধ হয় যেন বঙ্গ-জননীর, শ্রামল নিক্ক বজ্রাঞ্চলখানি মৃদুল পবনহিল্লোলে ছলিতেছে। বেদিকে নয়ন ফিরাই, কেবল শ্রামল শস্তপরিপূর্ণ ক্ষেত্র। প্রভাত-সমীরণ মৃদুমৃদু বহিয়া আসিতেছিল। দুই একটি লোক মাঝে মাঝে রক্তমঞ্চে অভিনেতার ভায়ে দেখা দিতেছিল। দুই একটি পাখী গাছের ডালে বসিয়া উবার আগমনী গাহিতেছিল।

দূর হইতে এই পথটি দেখিতে বড়ই চিত্তাকর্ষক। ইহাকে যেন সুনিপুন চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত চিত্র বলিয়া ভ্রম হয়। উপরে মেঘহীন নির্মল নীলাম্বর, অদূরে আকাশের কোলে দুইটি বড় বড় পাহাড়; উহাদিগকে নীলগিরি নামে অভিহিত করা হয়। দুই-দিকে প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ প্রান্তর, প্রান্তরের উপর শ্রামল শস্তক্ষেত্র। শস্তক্ষেত্রের শেষে ঘনশ্রামল তরুশ্রেণী, মধ্যে কেবল এই রক্তবর্ণ সরল রাজপথ চলিয়াছে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনই নয়নরঞ্জক।

প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, এমন সময় আমাদের পশ্চাৎ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিলেন “Good morning Baboos”.

ফিরিয়া দেখি সেই নির্জন পথে অল্পপৃষ্ঠে একজন সাহেব!

অধের হ্রোষধ্বনি বা কোন প্রকার শব্দ আমরা কেহই শুনিতে পাই নাই। হৃৎকের বিষয় সহসা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শিষ্টাচার-সম্মত অভিবাদন করিতে বিস্মৃত লইলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“I think, you are on your way to Gopinath.

“Yes sir.”

“I suppose you are new-comers in the place.”

“Yes, you are right.”

তিনি তখন বেশ পরিষ্কার বাজালায় ঝিঙ্কাসা করিলেন “আপনারা কি করেন ?” “কলিকাতায় ব্যবসা ও কাজকর্ম করি ।” “আপনি কি এখানে কর্ম করেন ?” “হঁ। আমি এই জেলার Magistrate” তারপর তিনি নানাবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে হইলেন । তাঁহার শিষ্টাচার দেখিয়া আমরা বিশেষ আপ্যায়িত ও সন্তুষ্ট হইলাম । প্রায় চারি মাইল আসিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইবার সময় তিনি বলিলেন—
“আমি অল্প দিকে চলিলাম, good bye”

এবার আর ভুল হইল না, যথারীতি অভিবাদন করিলাম ।

বেলা নয়টার সময় গোপীনাথের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম । এই মন্দিরটি বহুদিনের পুরাতন । তখন মন্দিরের সংস্কারকার্য চলিতেছিল । হিন্দু কারিকরগণ কাজ করিতেছিল । আট মাইল হাঁটিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম । নাটমন্দিরে পা ছড়াইয়া উপবেশন করিলাম । মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড চত্বর—চত্বরের মধ্যে বহু নাটমন্দির । চারিদিকে চক্ৰমিলান ঘর । এইখানে যাত্রীরা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে । মন্দিরের পশ্চাতেই রান্নাবাড়ী, ভাঁড়ার ঘর, ইত্যাদি অনেকগুলি ঘর আছে । একদিন ছিল যখন পায়ে হাঁটিয়া লোকে জগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিত, তখন গোপীনাথের বিশেষ জাঁকজমক হইত । দিনরাত যাত্রীর যাতায়াতে মন্দির ও চতুর্পার্শ্বস্থ স্থানসকল মুখরিত হইয়া উঠিত । মন্দিরের সম্মুখে একটা পুষ্করিণী—তাঁহার সোপানাবলী প্রস্তরনির্মিত । পুষ্করিণীর জল এরূপ সবুজ বর্ণ হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা মুখে দিতে স্বতঃই ভীতির সঞ্চার হইয়া

থাকে—মনে হয় সর্কবিধ ব্যাধির বীজানু যেন ইহার মধ্যে নিহিত
রহিয়াছে। পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন, “এইখানে চৈতন্যপ্রভু স্নান
করিয়াছিলেন,—এইখানে উপবেশন করিয়াছিলেন, স্মতরাং ইহার জল
গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগতীর্থের জলের তায় পবিত্র।” পাণ্ডা
ঠাকুর পুনঃ পুনঃ আমাদের স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা
তাহাকে জানাইলাম এই পুষ্করিণীর প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও
শ্রদ্ধা আছে ও ভবিষ্যতে থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে এখন
আমরা তীর্থ করিতে আসি নাই, বেড়াইতে আসিয়াছি, স্নানার্থ বস্ত্রাদি
সঙ্গে করিয়া আনি নাই। তারপর সেই জল স্পর্শ করিয়া আমরা
পবিত্র হইলাম। তাড়াতাড়ি দেবতা দর্শন করিয়া গত রজনীর একটু-
খানি প্রসাদ পাইয়া সেস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। বেলা
প্রায় বারটার সময় ঘণ্টান্তকলেবরে বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম।

দুই দিন পরে রাত্রি থাকিতে থাকিতে, আমরা সমুদ্র দেখিতে
বহির্গত হইলাম। পূর্ব হইতে একখানি গো-যান ঠিক করিয়া
রাখা হইয়াছিল। রাত্রি থাকিতে গাড়োয়ান আসিয়া আমাদের
উঠাইল। সমুদ্র দেখিয়া ফিরিতে সক্ষ্য হইবে বলিয়া সঙ্গে খানকয়েক
পাঁউরুটী, খানিকটা মাখন, ও কিছু মিষ্টান্ন লইয়াছিলাম। সমুদ্রে
সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিতে না কি অপূর্ব্ব; সেই জন্ত পথে আমরা
গাড়োয়ানকে খুব তাড়া দিতে আরম্ভ করিলাম, সূর্য্যোদয় দেখিবার
জন্ত মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। বালেশ্বর হইতে সমুদ্র
যাইবার পথটি বড়ই মনোরম, খুব ঈঁচু—দুই দিকে জলাভূমি।
এই রাস্তার মাঝে মাঝে গ্রাম দৃষ্ট হয়; সমুদ্রতীরে পৌঁছিবার অনেক
পূর্বেই পূর্বদিক রক্তিম ছটায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, আমরা
গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত চলিতে লাগিলাম। তখন পথে

দুই একজন লোক শাকসব্জির বোঝা লইয়া সহরের অভিমুখে চলিয়াছে, দুই একটি বালিক কুটীরের দ্বারে বসিয়া মুড়ি খাইতেছে, কোথায় বা শ্রমশীলা বধূগণ গৃহপ্রাঙ্গণে গোময় লেপন করিতেছে, কেহ বা রোরুগ্ধমান শিশুটিকে ভুলাইবার জন্ত গৃহদ্বার অন্ন মুক্ত করিয়া চলিছে গরুর গলদেশের ঘণ্টার ধ্বনি বালককে শুনাইতেছে। এই সব দৃশ্য বড়ই মধুর লাগিল। গাড়োয়ান পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, “আপনারা গাড়ীতে উঠুন, সমুদ্র এখন হইতে এক ক্রোশ পথ।”

আর গরুর গাড়ী চড়িতে ভাল লাগিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

অর্ধক্রোশ থাকিতেই পথে পায়ে পায়ে নীত বালুকারাজি দৃষ্ট হইল। দূরে চাহিয়া দেখি যেন একটি অত্রের প্রাচীর সূর্যালোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তাহা হইতে যেন শত সহস্র আলোকবিন্দু বিচ্ছুরিত হইতেছিল। গাড়ী আমাদের অনুসরণ করিতে সক্ষম হইল না। তখন বেলা প্রায় সাতটা বাজিয়াছে। অরুণের মধুর রশ্মি মুখের উপর পড়িতে লাগিল। সেদিকে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য নাই—গন্তব্য পথাভিমুখে ছুটিতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে পথটা বালুকাময় হইয়া আসিল, আর জুতা চলে না, সুতরাং গাড়ীর জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। গাড়োয়ান তখন খোলা মাঠের পথে—প্রভাত সমীরে তাহার অভ্যস্ত সঙ্গীতের সুধা-ভাণ্ড ঢালিয়া দিতেছিল, তাহার কণ্ঠনিঃসৃত উড়িয়া গান ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছিল।’ গাড়ীতে জুতা জামা রাখিয়া সেই পূর্ব-বর্ণিত অত্রের প্রাচীরের ন্যায় বালিয়াড়ীর উপর উঠিলাম। সেখান হইতে দৃষ্টি যতদূর নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতে যাহা দেখিলাম তাহা

ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বিস্তীর্ণ জলধি, অনন্ত-জলোচ্ছ্বাস—সংখ্যাভীত তরঙ্গের জন্মমৃত্যু—অসীমের মধ্যে সসীমের কল্পনা যেন হেথায় লয় পাইতে লাগিল, আকাশের সহিত বারিধি যেখানে সন্ধি করিয়া কাল কসি টানিয়া দিয়াছে, সেখানে ব্যবধানের পরিবর্তে মিলনের বিরাট বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে।

পর্বতের মত উচ্চ বালিয়াড়ীর চূড়ায় দণ্ডায়মান হইয়া মনে পড়িয়া গেল সেই ভীমকায় কাপালিকের কথা, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল সেই করুণাকাতরকণ্ঠনিঃসৃত প্রশ্ন “পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?” আমাদের মনে হইল, আমরাও বুঝি আজ পথ হারাইয়াছি—মনে হইল, যদি পথ চিনিয়া আমরা গাড়ীর কাছে পৌঁছাইতে না পারি তবে হয়’ত অবশেষে এই সমুদ্রের সৈকতে ছুটিয়া বেড়াইতে হইবে। কতবার মনে হইল, যদি সমুদ্র একবার তাহাৎ অসংখ্য বীচিমালা সংহরণ করে, তবে তাহার অনন্ত অসীম বারিরাশির বিশাল বিস্তৃতি উপলব্ধি করি।

এই সময় সহসা তরঙ্গগুলি ক্রমশঃ পশ্চাদ্গামী হইতে শুরু করিল। আমরা যেখানে দণ্ডায়মান ছিলাম, সেখান হইতে জল সরিয়া যাইতে লাগিল; সে এক অপূর্ণ ব্যাপার! উর্ধ্বগুলি উর্দ্ধধামে ছুটিয়া আসিতেছে, যেন এক মুহূর্তেই তটভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলাই তাহার লক্ষ্য, তাহার কাজ, তাহার সাধনা; কিন্তু পরক্ষণেই পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া তাহারা অসংখ্য ফেনপুঞ্জের সৃষ্টি করিতেছে। দেখিতে দেখিতে জলধি প্রায় এক মাইল সরিয়া গেল, আমরা উল্লাসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। তাহার মধ্যে যে কি আনন্দ! কি তৃপ্তি! কি সুখ! তাহা বলিতে পারি না। যখন সমুদ্র সরিয়া যাইতেছিল তখন সেই

জলমগ্ন ভূমির জলহীন অবস্থা প্রকাশ পাইল, তাহা যেন স্মৃচিকণ
সিমেন্ট করা গৃহতল বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

আমরা যখন সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিতেছি তখন দেখি, হাজার
হাজার সজীব কড়ি, ঝিনুক, শঙ্খ, ও নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত
জলজন্তুও ছুটিয়াছে—এই দৃশ্য আমাদের নিকট যেন কবির কল্পনা
বা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। এখানে একটি Light house ও দুর্গ
আছে; অনেকগুলি ইংরাজ ঐ দুর্গে অবস্থান করে। এখানকার
সমুদ্র তত গভীর নয়। একটি জেলের মেয়ে আসিয়া যদি না
বলিত,—“এইরূপ জল সরিয়া যাওয়া সমুদ্রে “ভাটা পড়া” এবং
ইহা বড় বেশীক্ষণ থাকে না, এখনি জোয়ার আসিবে, তখন
আমরা দ্রুত ছুটিয়াও কিনারায় উঠিতে পারিব না, তাহা হইলে
জানি না কি ভয়ানক বিপদে পড়িতাম। সমুদ্রে স্নান করিয়া
কড়ি, ঝিনুক, শঙ্খ কুড়াইয়া বেলা আন্দাজ একটার সময় সেখান
হইতে বাসায় যাত্রা করিলাম। বাসায় পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া
গেল। পরদিন সেবারকার মত অভিযান শেষ করিয়া, বন্ধুর
নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, কলিকাতা যাত্রা করিলাম। সেই
কড়ি ঝিনুক শঙ্খগুলি প্রতিবার লক্ষ্মীপূজার সময় গৃহিণী যখন
সাজান, তখন আমার সেই জেলের মেয়ের সাবধানতার কথা মনে
পড়িয়া যায় এবং তাহাকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না।

খুরদা ।

খুরদারোড কলিকাতা হইতে ২০৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটা বড় জংসন। এখান হইতে দুইদিকে দুইটি শাখা লাইন চলিয়া গিয়াছে; একটা ভগবান জগন্নাথদেবের পুরীর দিকে, অপরটি মাদ্রাসপ্রদেশের অভিমুখে। “খুরদারোড” পুরীর পথে পড়ে বলিয়া ইহার নামের সহিত অনেকেই পরিচিত। সময় সময় অনেককে এখানে মেল হইতে অবতরণ করিয়া পুরীর জন্ত নির্দিষ্ট গাড়ীতে আরোহণ করিতে হয়। হাওড়া হইতে যাত্রা করিয়া পুরীর পথে এই খানে প্রভাত হয়। স্মৃতাং এখানকার ভোরবেলাটি বড়ই মনোরম ও চিত্তাকর্ষক! স্নিগ্ধ সমীরণ সমুদ্র হইতে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া পথিকের অঙ্গস্পর্শে বিনিদ্ৰ রজনীর সমস্ত অবসাদ ক্লান্তি, যুহুর্ভে অপসারিত করিয়া দেয়। রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়া পথে দিবার প্রথম আলোকের সহিত যেখানে পরিচয় হয়, সেটি নিজ খুরদারোড। খুরদা সেখান হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী হইলেও তাহার দিগন্তপ্রসারিত শস্ত-শ্রামল প্রান্তর, নীহার-সমাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণী, নীল নির্মেষ নভোমণ্ডল নয়নসম্মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এখানে যখন গাড়ী আসিয়া পৌঁছায়—তখন যাত্রীদিগের প্রাণে জগন্নাথদর্শনের আকুলতা জাগিয়া উঠে—আর ত অধিক দূর নাই; নিশীথিনীর অবসানে প্রভাতের স্মৃতিতল সমীরণ কমনীয় করস্পর্শে তাহাদের আহ্বান করে। অদূরে সুবর্ণকিরণে ঝলসিয়া তরুণ অরুণউদয় কি মধুর দেখায়! এমন সময় সাধারণতঃ মানুষের মন বেশ সুস্থ, নিশ্চিন্ত, জড়তা লিনতাবিহীন থাকে। তাহার উপর এই নিফলক স্নিগ্ধ মনোরম দৃশ্য তীর্থযাত্রীদিগের হৃদয়ে যে এক অনির্বচনীয় ভাবরাজ্যের পবিত্রতা জাগাইয়া তোলে, তাহার তুলনা করা অসম্ভব।

আমরা যখন খুরদায় আসি, তখন কার্তিক মাস। পুরীর গাড়ীতে অসম্ভব ভিড়। অনেকেই ৩পূজার ছুটিতে স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্ত আসিয়া দেবতাদর্শন করিয়া যাইতেছেন। ‘খুরদারোড’—পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি,—একটা রেলওয়ে জংসন মাত্র। এখানে চাকুরী উপলক্ষে অনেকগুলি ইংরাজ, তৈলিঙ্গী, মাদ্রাজী, উড়িয়া, খুব অল্প-সংখ্যক বাঙ্গালীও অবস্থান করেন। এখান হইতে নিজ খুরদা সাত মাইল দূরে—গো-যান সাহায্যে গমনাগমন করিতে হয়। খুরদা রোডের জলবায়ু ভাল, তবে নিজ খুরদার মত নয়। খুরদার মত স্বাস্থ্যকর স্থান এ অঞ্চলে বড় পরিলক্ষিত হয় না।

ভুবনেশ্বর হইতে জনকয়েক বাঙ্গালীবাবু আমাদের গাড়ীতে উঠেন। তাঁহারা খণ্ডগিরি দেখিয়া পুরীদর্শনে চলিয়াছেন। এই অল্প সময় টুকু গাড়ীতে বড় আনন্দে কাটিয়াছিল। কান্তকবি রজনীকান্তের ছবি ‘মানসী’তে দেখিয়া তাঁহারই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে একজন রজনীবাবুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি কবির সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিয়া নানাকথা বলিতে লাগিলেন। কবি শেষমুহুর্ত পর্যন্ত কিরূপ নিদারুণ যন্ত্রণার ভিতর হাস্তমুখে বীণাপাণির সেবায় অনুরাগ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা মুগ্ধ হৃদয়ে সেই সকল কথা শুনিতে লাগিলাম। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নয়ন অশ্রু-পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। ভুবনেশ্বর হইতে খুরদারোড বড় বেশী দূর নয়; শীঘ্র গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আমি তখন তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

মনে করিয়াছিলাম, হয়ত কেহ না কেহ আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু অত ভোরে শয্যাভ্যাগ করিয়া আসা একপ্রকার তীব্র সাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্মরণ্য সহজে কে

আর ঘাড় পাতিয়া সেটা বহিতে চায় বলুন। শীতবস্ত্র মুড়ি দিয়া অনেকগুলি মুখের নিকট মুখ লইয়া গেলাম, পাছে শেষে বাসায় গিয়া আপশোষ করিতে হয় ‘আহা লোকটা গিয়াছিল, দেখা হয় নাই’।

ষ্টেশনের নিকটেই আমার আত্মীরের বাসা। জিনিসপত্রগুলি, কেন্দ্রার কোম্পানীর— অতিথিশালায় ‘জিন্মা’ দিয়া বাসায় চলিলাম।

বাসার নিকট গিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিতেই গৌরী চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দ্বার উদঘাটন করিয়া দিল।

তারপর সে একটু দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইল, চিনিতে পারিয়া আগ্রহভরে ছুটিয়া আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল—সেই সপ্তম-বর্ষীয়া বালিকার আহ্বানে যথেষ্ট আনন্দ ও সুখ পাইয়াছিলাম, তাহার হর্ষোৎফুল্ল চঞ্চল নয়নে যে পুলকআলোক দেখিয়াছিলাম, এই কয়দিনের না দেখার মধ্যে গৌরী তাহা কোথায় পাইল বুঝিলাম না।

“গৌরি, তুই কেমন আছিস্” বলিতে সে ঘাড় নাড়িল, বলিল “বেশ আছি”। তারপর বলা নেই, কওয়া নেই, হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

আমি যে বাসায় গিয়া উঠিলাম সেটা রেলওয়ের সীমানার ভিতর। বাসার চতুর্দিকেই রেল-বেষ্টিত সাহেবদিগের বাংলা। দুই একঘর মহারাষ্ট্রীয় ও তেলুগু ব্যতীত সব গুলিই সাহেবদিগের বাড়ী।

এখান হইতে পুরী সাতাশ মাইল দূরে। চিলকা-হ্রদ খুব নিকটেই।

‘খুরদারোড’ স্থানটি একটি পাহাড়ের উপর স্থাপিত বলিয়া মনে হয়। প্লাটফর্মের উপর হহতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে, দুইদিককার লাইন ঢালু হইয়া গিয়াছে। গাড়ী খুরদায় আসিবার সময় ধীরে ধীরে

উঠিতে থাকে এবং পুরী ও মাদ্রাজের অভিমুখে যাইবার সময় অল্পে অল্পে নামিয়া যায়। এই স্থানটি উচ্চ হওয়াতেই অনেকদূর পর্য্যন্ত নয়নগোচর হয়।

যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত মুক্ত শ্রামল ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র বৃহৎ গিরিশ্রেণী—আর কোথাও বা দুই চারিটি তরুশ্রেণী সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ স্তম্ভ পথিকের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। খুরদারোড জায়গাটি আমার বড় পছন্দ হইয়াছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এত শোভা-সম্পদ একাধারে খুব কম অবলোকন করিয়াছি। উৎসব-দিনের মত মাঝে মাঝে যাত্রীগাড়ী আসিলেই স্থানটি মুখর ও চঞ্চল হইয়া উঠে। তার পরেই নীরব নিস্তরঙ্গ। কৰ্ণ-কোলাহলের শব্দরোল ছুটিয়া আসিয়া শান্তি-অশ্রু-প্রবাসী হৃদয়ে অভাব-অভিযোগ বা বিরক্তি-বেদনা আনিয়া দেয় না।

ষ্টেশনটির নাম খুরদারোড হইলেও এই স্থানটির প্রকৃত নাম 'জাটনি'। ঐ নামেই পোষ্টাপিসের নামকরণ হইয়াছে। এখানে চারপাঁচজন মাত্র বাঙ্গালী আছেন। তাঁহারা রেলওয়ে, মেল সারভিস, হাঁসপাতালে ও কেলনার আপিসে কৰ্ম্ম করেন। পশ্চিমে বাঙ্গালীদিগের ভিতর বেশ একটা আন্তরিক সহানুভূতি পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু দক্ষিণে তেমন দেখিলাম না। ডাক্তারবাবু অতীব অমায়িক লোক। সকলকেই নিজের আত্মীয়ের মত দেখেন। প্রতিদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া সকল বাড়ীর খোঁজ-খবর লইয়া যান। ভদ্রলোক বড় মিষ্টভাবী ও সদালাপী। তিনি সপরিবারে এখানে থাকেন। খুরদারোড হাঁসপাতালের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার তাঁহার স্বন্ধে। আমাদের বাসার কিছুদূরে মাঠের সম্মুখেই হাঁসপাতাল, তাহারই সন্নিকটেই ডাক্তারবাবুর বাসা। হাঁসপাতালটির চারিদিকে ঘন তরুশ্রেণীর স্নিগ্ধ

ছায়া ও নির্মল বাতাস যাতনাক্রিষ্ট রোগীর অন্তরে তপোবনের শান্তি ও সুধা একসঙ্গে ঢালিয়া দেয় । এই হাসপাতালটি দেখিলে আতঙ্ক না হইয়া বরং আশার সঞ্চার হয় । ডাক্তারবাবুর সহিত আলাপ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম । এখানকার রেলের পথগুলি পরম সুন্দর । দুই দিকে সম-উচ্চ শ্রেণীবদ্ধ-তরুশ্রেণী । লাল-কঙ্কর-সমাচ্ছন্ন রাস্তাগুলি পরিষ্কার । জঙ্গল কাটিয়া স্টেশন স্থাপিত হইয়াছে, সেই উপলক্ষে একটা সামান্য বাজারও বসান হইয়াছে । এই বাজারে তরিতরকারি বড় পাওয়া যায় না । তবে আশপাশের গ্রাম হইতে চা'ল আমদানী হইয়া নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে । পাটের ব্যবসা উপলক্ষে অনেক লোক বাজারে দুই চারখানি আড়ত করিয়াছে । কমলানেবু, আতা, রস্তু প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে সুলভমূল্যে পাওয়া যায় । মৎস্য বড় পাওয়া যায় না । এখান হইতে খুরদার গরুর গাড়ীর যাতায়াত ভাড়া বার আনা ।

উড়িষ্যাপ্রদেশে সুলভের মধ্যে গো-যান ভাড়া ! তবে আরোহণের সুখটী ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের পক্ষে অভিনব হইতে পারে । এইখান হইতে সরল লাল পথ খুরদার মধ্যে গিয়াছে । এই পথের দুইধারে কেবল বিশাল মুক্ত ক্ষেত্র ও গিরিশ্রেণী ।

একদিন মাত্র বিশ্রাম করিবার পরদিন বন্ধু জ্ঞান বাবু আসিয়া জুটিলেন, তাঁহার সমভিব্যাহারে নিজ খুরদা দেখিতে বেলা দুইটার সময় রওনা হইলাম ।

একখানি সতরঞ্চ ও একটা উপাধান গাড়ীর শয্যা হইল । শয়ন করিয়া যাইব এইরূপ সঙ্কল্প । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ঘটে নাই । সারা পথটি দেখিতে দেখিতে চলিলাম । অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের গাড়ী নবনির্মিত রাস্তা হইতে পুরাতন পথে গিয়া পড়িল । পুরাতন

পথ গুনিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিবার কিছুই নাই। নূতন অপেক্ষা এই পুরাতন পথটি বড়ই মনোরম। কোথাও একটুমাত্র উঁচুনীচু নাই, সমস্ত পথটি সরল, সমতল, পরিষ্কার। উভয় পার্শ্বে সম-উচ্চ তরুশ্রেণী। তাহাদের মধ্যে নানাজাতীয় বৃক্ষ নয়নগোচর হয়। অধিকাংশই আম, জাম, বট, দেবদারু, শিরিষ, শাল, শিষু প্রভৃতি। রাস্তার উভয় পার্শ্বের নিম্নেই শস্যশ্রামল ক্ষেত্র। প্রায় পরিপক্ব শস্যে পরিপূর্ণ ও সমুজ্জল, ক্ষেত্রগুলি তখন কনকাক্ত ওড়ণার মত মুহু সমীরণ সংস্পর্শে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। কোথাও বা ক্ষুদ্র তটিনীর স্বল্প বারিরাশি রৌদ্রকিরণে জরির পাড়ের মত ঝিকিমিকি করিতেছিল। দূরে, কঠিনহৃদয় পাহাড়গুলি যেন শুষ্ক ও নির্ঝাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে দৃশ্য কি চিত্তাকর্ষক! কি প্রাণস্পর্শী!

এ প্রকার সুন্দর রাস্তা ইহার পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। টুঙুলার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে দিয়া 'গ্রাণ্ড-ট্রঙ্ক রোড' দিল্লী অভিমুখে গিয়াছে দেখিয়াছি; তাহার সৌন্দর্য্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব কিন্তু এমনটি নয়। ইহা অপেক্ষা সে পথ প্রস্থে ও দীর্ঘে অনেক বড়, অনেক প্রাচীন বৃক্ষাদিসুশোভিত, তথাপি বলিব এমনটি নয়! সে পথের উপর কেমন যেন একটা অতীতের মলিন রেখা পড়িয়াছে, বৃক্ষগুলি যেন শীর্ণ, দুর্বল, জীবন্মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। পথের বন্ধের দীর্ঘশ্বাস, যেন মনে হয় যুগী বাতাসের মত ব্যাকুল অন্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাই বলিতেছি সে পথ এমনটি নয়!

গো-যান আরোহণে বন্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ। স্মৃতরাং বেচারীর অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। মাঝে মাঝে বাঁশের ছইয়ের সহিত মাথার বেশ একটু ঠোকাঠুকি চলিতেছিল। আর সে 'উহ উহ' করিয়া পদব্রজে গমনের জ্ঞান অসংখ্য যুক্তির অবতারণা করিতে লাগিল।

আমাদের সারথি ছিল একজন উৎকলবাসী। হাস্যের সহিত তাহার তাড়াতাড়ি কথা বলা আমাদের মোটেই বোধগম্য হইত না। তাহার সুমিষ্ট বাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেই সে ভারি রাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার বিশ্বাস, যে তাহার কথা প্রায় বাঙ্গালা কথার মত সরল ও বাঙ্গালীর অনায়াস বোধগম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খুরদার অনেকগুলি বাঙ্গালী বাবুও নাকি তাঁহার এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

রাস্তার বন্ধ হইতে মাঝেমাঝে এক একটা সরু পথ মাঠের উপর নামিয়া গিয়াছে। সেগুলি কোনো একটা পাহাড়ের কোলে গিয়া মিশিয়াছে। দুই চার ঘর কুবকের কুটীরকে অবলম্বন করিয়া এই স্থানগুলি এক একটা গ্রামের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। এ তলাটে লোকের বাস অত্যন্ত কম। পথেও লোকজন খুব কম দৃষ্ট হয়। মাঝে মাঝে দুই একখানি গরুর গাড়ী যাত্রী লইয়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়াছে। দূরগত গরুর কর্ণলগ্ন ঘণ্টার শব্দ নির্জন পথের উপর বেশ মধুর শুনায়। জ্ঞানবাবু গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বাড়ী এখান হ’তে কত দূর?”

সে তখন অন্তমিত সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত অদূরবর্তী একটা পাহাড়ের উদ্দেশে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল “ওই বরুণা পাহাড়ের কোলে।”

সারি সারি পাহাড় স্তূতরাং জ্ঞানবাবু বলিলেন “কোনটি?”

সে অল্প উচ্চস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল “বরুণী দেবীর পাহাড় কোনটি তা জানেন না, কি আশ্চর্য্য!”

আমি বলিলাম “উনি নূতন এদেশে এসেছেন। আমি ও সব জানি। তুমি শিগ্গির গাড়ী চালাও, নতুবা ফিরিতে অনেক রাত্রি হয়ে যাবে।”

“আর বেশী দূর নাই, আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছাইব।” বলিয়া বলিল “বাবু মহাশয়, একবার দেশলাইটা দিন ত। তারপর শালপাতা জড়ান খানিকটা দোক্তার মুখে সাদরে অগ্নি সংযোগ করিল। এইবার সে তাহার সারথ্যকার্যে সাধ্যমত কৌশল প্রদর্শন করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিল না।

আমি জ্ঞানবাবুর অঙ্গ ঠেলিয়া বলিলাম “আমাদের সারথির পায়ভারি দেখ্‌চি।”

জ্ঞানবাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন “এ দেশের অনেকেই পদগোরব আছে দেখিতেছি।” ধূমপানে গাড়োয়ানের বোধ হয় বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল। সে প্রথমে মিহিসুরে সংস্কীতবিদ্যার আলোচনার প্রবৃত্ত হইল। সে মধুর, কি কৰ্কশ, ঋতিযোগ্য কি অযোগ্য, বোধগম্য কি অগম্য, তাহা যাঁহারা উৎকলদেশীয় সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন। তবে আমার মনে হইতেছিল থামিলেই বাঁচি।” আমি বলিলাম “তুমি ত বেশ গাহিতে পার?” সে তখন অত্যন্ত খুসী হইল। মুখখানির উপর বিনয়ের ভাব আনিয়া, কতই সৌজন্ত দেখাইয়া মৃদুমধুর হাসিয়া বলিল “আজ্ঞে পারি, তেমন ভাল পারি কি? কিন্তু বাঙ্গালীবাবুরা রাত্রিবেলা আমার গাড়ীতে এলেই বলেন ‘তুমি গীত গাও আর গাড়ী চালাও।’ আমার গান শুনতে শুনতে তাঁরা খুব হাসেন।”

সে পুনরায় গান ধরিবার জন্ত সুর ভাঁজিতেছে শুনিয়া জ্ঞানবাবু বলিলেন, “হাঁ হে, এদেশে তোমরা কত দিন আছ?”

একগাল হাসিয়া সে কহিল “তখন ইংরাজ বাহাদুর এ দেশে আসে নাই। মোর বাপ্‌মার বাপ্‌মা, তার বাপ্‌মা, জগন্নাথপ্রভুর রূপায়

এখানে বাস করছে। সে কত যুগ হয়ে গেল। এদেশে কি এমন জঙ্গল ছিল বাবু! তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল ‘খুব বড় সহর ছিল। ইংরাজ বাহাদুরের সঙ্গে একদিন রাজার বড় যুদ্ধ হয়েছিল।* বরুণা ও করুণা দুই বোন রাজার সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। সরকার বাহাদুরের ফৌজ কি সে লড়াইয়ে টেকে পারত? তাহারা যতই কামান ছাড়তে লাগল, আর বরুণা ও করুণাদেবী রাজার আগে গিয়ে সে সব গোলা লুফে লুফে ছুড়ে ফেলে দিতে লাগলেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “যে রাজা যুদ্ধ করেছিল তার নাম কি?” সে তখন বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল স্মৃতিরাং তীব্রস্বরে উত্তর করিল “নারায়ণ ভঞ্জের নাম শুনে নাই।” এইবার আমাদের সারথি ঐতিহাসিক হইয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিল। সে বলিতে লাগিল “নারায়ণভঞ্জের সঙ্গে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত লড়াই চলতে লাগল। সরকার বাহাদুরের জিত হবার কোনও আশা নাই দেখে তাহারা একটা অস্ত্রায় মতলব ঠিক করলে। একটা গরু কেটে সেই রক্তে গোলা ভিজিয়ে যেমন ছুড়লে, আর অমনি অপবিত্র গোরুর ভয়ে বরুণা ও করুণা দেবী রাজাকে ডেকে বল্লেন, এবার আর আমরা থাকতে পারব না; ঐ গোলা আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করলে আমরা শ্লেশ হয়ে যাব। তারপর তাঁরা আকাশে মিলিয়ে গেলেন। তখন সেই গোলা এসে রাজার সৈন্তের উপর পড়ল, আর হাজার হাজার লোক মরতে লাগল। কামানের সঙ্গে তীর ধনুক তলোয়ার কতক্ষণ পারে বলুন?

* খুরদায় একটা বড় পাহাড় আছে, উহার নাম ‘বরুণা’ পাহাড়। অনেকে বলেন, ইহা পরেশনাথ পাহাড়ের অপেক্ষা উচ্চ।

আমি বলিলাম “তা’ত বটেই ! কামান আর তলোয়ার ! আকাশ
আর পাতাল !”

জ্ঞানবাবু মুখে রুমাল দিয়া হাসিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা
করিলেন “যে লোকগুলি সেই গোলার আঘাতে মরে ছিল, তাহাদের
বোধ হয় আর সৎকার হয় নাই। তাহারা তখন স্বেচ্ছ হয়ে গিয়েছিল
কি বল ?”

“আজ্ঞে হাঁ”

এবার আমরা উভয়ে হাত সংবরণ করিতে পারিলাম না। সে
তখন নানা অলৌকিক গল্প শুরু করিয়াছিল। আমাদের মত
নির্ধীরোদ শ্রোতাও বোধ হয় তাহার অদৃষ্টে ইতিপূর্বে আর লাভ
হয় নাই। জ্ঞানবাবু বলিলেন “এদের কি অন্ধ বিশ্বাস ! এরা
এসব কথা ত অশ্রদ্ধা বদনে বলিয়া যায়।”

সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই আমাদের রথ বরুণা-দেবীর পাহাড়ের
পাদমূলে গিয়া উপস্থিত হইল। এই পর্বত হইতে একটি ক্ষুদ্র তটিনী
নির্গত হইয়াছে। সারথি এই নিষ্করিনীর কতই কীর্তিকথা বলিতে
লাগিল। ইহার মত জল নাই। এই জল বরুণাদেবীর পাদপদ্ম হইতে
বাহির হইয়াছে। দেবীর চরণামৃত পান করিলে কোনো রোগ থাকে
না। সেইজন্য তাহাদের অসুখ খুব কম। সে আমাদের পুনঃ পুনঃ সেই
জল পান করিতে অনুরোধ করিল। এই নিরঙ্কর নগণ্য উৎকল-
বাসীর নিঃশব্দ বিশ্বাস অবলোকন করিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম।
তাহার সরল বিশ্বাসে পাছে আমাদের অধুনিক সভ্যতার সন্দেহ ছাপ
পড়ে, মনে করিয়া দুই গণ্ডুষ জল আগ্রহভরে পান করিলাম।

গাড়ীতে জুতা চাদর ছাড়িয়া পাহাড়ে আরোহণ করিলাম।

গাড়োয়ান আমাদের পথ-প্রদর্শক হইল। তখন পশ্চিম গগনে

সূর্য্যদেব চলিয়া পড়িয়াছেন। পাহাড়স্থিত বৃক্ষরাজির উপর ছায়াবাজির মত টুকরা টুকরা রৌদ্র মিলাইয়া আসিতেছে।

পাহাড়টি খুব উঁচু। বান্দালার মধ্যে পরেশনাথ পাহাড় সকল অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া আমার ধারণা ছিল। কিন্তু বোধ হইল এ পাহাড়টি তাহা অপেক্ষাও উচ্চ। পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিলাম, চতুর্দিকে কাল পাহাড়। কাল পাহাড়ের ফ্রেমে একখানি স্বভাবচিত্র কে যেন বাধাইয়া রাখিয়াছে। দূরে অনেকগুলি পুরাতন প্রাচীর ও অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ দৃষ্টিগোচর হইল। অল্পসন্ধানে জানিলাম সে গুলি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ। একটা বৃহৎ মূর্তিকার স্তূপের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্ব্বক গাড়োয়ান বলিল “এখানে রাজার বাড়ী ছিল। সেই ভগ্নস্তূপের প্রতি তাকাইয়া অনেক কথা স্বপ্নের মত স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল। একদিন যে সৌধচূড়ার উপর উড়িয়াধিপতির গৌরব পতাকা উড্ডীন হইত—সেইখানে কতকগুলি পুরাতন ইষ্টক স্তূপীভূত হইয়া বর্তমানকে ধ্বংসের আশঙ্কায় শঙ্কিত করিতেছে।”

উড়িয়াপ্রদেশে খুরদা—হিন্দুরাজার স্বাধীন রাজধানী ছিল। একদিন ছিল যখন মহারাজ্যীয়দিগের বিপুল অশ্বারোহী সৈন্যদল খুরদার ঘন নিবিড় জঙ্গল ভেদ করিতে পারে নাই এবং তাহার চতুর্দিকে বেষ্টিত শৈলশ্রেণীও লজ্জন করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিল। ১৮০৪ সালে খুরদার রাজা, নারায়ণভঞ্জ ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন এবং তাহার পরিণামে তাহার রাজ্য ইংরাজাধিকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।

১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে এখানকার কৃষকগণ একবার বিদ্রোহাচরণ

করিয়াছিল। কিন্তু খুব শীঘ্র তাহাদিগকে শান্ত করিয়া ফেলা হয়। ইহার পর হইতে যদিও খুরদার রাজা কোনও প্রকার স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করে নাই, তথাপি এ অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিত। কারণ এই রাজবংশ উত্তরাধিকারসূত্রে মহাপ্রভু জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের রক্ষক বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৮ সালে খুরদার রাজা হত্যা অপরাধে দ্বীপান্তর গমন করেন। পুরীর পথে পড়ে বলিয়া খুরদারোডের সহিত আমরা যতটা পরিচিত, এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পরিপূর্ণ খুরদার সহিত ততটা পরিচিত নই।

খুরদা যে একদিন হিন্দুরাজধানী ছিল; একথা খুরদার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় না। যেখানে পূর্বে নগর ছিল এখন সে স্থানটা পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। সেই সকল স্থানে গমনাগমন করিতে বিশেষ আশঙ্কা হয়, কারণ কালের কঠিন আঘাতে সে রম্য উদ্যান নাই, সে রাজপ্রাসাদ নাই; সে সৌন্দর্য্যময়ী নগরও নাই, আছে কেবল রাশি রাশি ভগ্নস্তূপ আর অশ্রুপূর্ণ নয়নের মত সহস্র সহস্র কূপ।

আমরা ধীরে ধীরে মন্দিরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের সম্মুখে দুইজন উড়িয়াব্রাহ্মণ তখন বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। হঠাৎ শিকার দেখিলে ব্যাঘ্র যেমন প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া যায় ইহারাও তেমন প্রথমটা সহসা সেই নির্জজন পাহাড়ে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পরে যাত্রী বুদ্ধিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারাই মন্দিররক্ষক ও পুরোহিত। মন্দিরে গিয়া পূজা দিলাম, দেখিলাম দুইটা স্ত্রী-মূর্তি পাশাপাশি। একজনের নাম বরুণা, অপরের

নাম করুণা । মূর্তির চরণের নিম্ন হইতে একটা সুস্ন নালা, তাহা হইতে স্বচ্ছ বারিরাশি নির্গত হইতেছে । মন্দিরটি খুব ছোট, ভিতরে অত্যন্ত অন্ধকার । ব্রাহ্মণ প্রদীপ জালিলেন । স্থানটি জন-কোলাহল শূন্য, নির্জন, নিস্তব্ধ ও মনোরম ।

পাণ্ডা এই মন্দির সম্বন্ধে অপূর্ব অপূর্ব কাহিনী বর্ণনা করিলেন । তারপর বলিলেন “এই পর্বত বড় সামান্য নয় । এইখানে পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন । পাহাড়ের উপরে তাঁহাদের সেই সকল গুহা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে । যে শমীরক্ষে পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগের অস্ত্রাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন ; সেই বৃক্ষ অद्याপি এই পাহাড়ের উপর বর্তমান রহিয়াছে । যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, ত এখনি দেখিতে পারেন ।”

পাণ্ডার কথা তখন তর্কের দ্বারা উড়াইয়া দিবার মত কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না । মেদিনীপুরের নিকট অনেকে বলেন বিরাট রাজার গো-গৃহের নিদর্শন আজও রহিয়াছে । তখন এই পর্বতে যে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস না করিয়াছিলেন, তাহা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করি । হয় ত এখানে তাঁহারা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ম ও অবস্থান করিয়াছিলেন । পাণ্ডার সহিত অনেকদূর পর্য্যন্ত উপরে উঠিলাম কিন্তু ক্রমেই নিবিড় জঙ্গল, আর ঘন অন্ধকার । সূর্য্যের আলো বোধ হয় মধ্যাহ্নেই প্রচুর পরিমাণে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না । তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে । পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “আর কত দূর ?” তিনি উত্তর করিলেন “আরও অনেক উঁচুতে উঠিতে হইবে । আপনারা বড় বিলম্ব করিয়া আসিয়াছেন ।”

আমরা বলিলাম “তবে থাক, আর একদিন সকাল সকাল আসিব ।” সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া সেখান হইতে

বর্তমান খুরদা সহরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে Excise Inspector শচীন্দ্রবাবুর বাসায় গিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া খুরদারোডের জন্ত যাত্রা করিলাম। খুরদা একটা সবডিভিসন, আদালত, জেলখানা-হাঁসপাতাল ইন্সকুল, থানা প্রভৃতিতে সুশোভিত। রাস্তা ঘাট খুব সুন্দর। এখানকার জল বায়ু খুরদারোড অপেক্ষা ভাল, পূর্বেই বলিয়াছি। কারণ এখানকার অধিবাসীরা ঝরণার জল পান করিয়া থাকেন। খুরদার ভিতর দিয়া “গঞ্জম” রোড মাদ্রাস অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। খুরদাটি বেশ ছোট খাট সহর। সন্ধ্যার অল্প পরেই গো-বানে আরোহণ করিলাম। তখন আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। পাহাড়গুলি সেই মেঘের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে, রাত্রি দশটার সময় খুরদারোডে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন দেখি গৌরী আমাদের জন্ত বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে বাড়ার ভিতর সংবাদ দিতে দৌড়াইল। গৌরীর জন্য ঠাকুরের ফুল ও সিন্দুর আনিয়াছিলাম। সে খাবার অপেক্ষা নির্খাল্য ও সিন্দুর অত্যন্ত আগ্রহভরে মাথায় ছোয়াইয়া গ্রহণ করিল। মনে হইল, গৌরী “এযে তোমার পূজা মা, তুমি নিজেই করিলে” এই ছোট মেয়েটি যেন ইহাদের প্রবাসবাসের আনন্দ-আলোক।

চক্রধরপুর

বেড়ানোর নেশাটা, আমার বাল্যকাল হইতেই আছে বলিলেই হয়। সে আজ প্রায় আট বৎসর অতীত হইল এক দিন ৬পূজার কিছু পরে বাড়ীতে বসিয়া আছি, মনে বড় সুখ নাই। সঙ্গী-অভাবে সে বৎসর কোথাও বেড়াইতে যাওয়া হয় নাই। মন কস্ কস্ করিতেছে। সহসা খেয়াল চাপিল, আর অযথা অলসের মত বসিয়া বসিয়া সময় কাটানো ভালো লাগে না, যে খানে হোক এক দিকে যাওয়া যাক। তার পরদিন, বেলা বারোটার সময় বাড়ী হইতে রওনা হইলাম। তখনকার দিনে বেলা দেড়টার সময় বন্ধেমেল ছাড়িত। আমার কেমন স্বভাব পূর্ক হইতে কোথায় যাইব, তাহার বড় ঠিক করিতে পারি না। সুতরাং ষ্টেশনে আসিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ‘পুকলিয়ার’ একখানি টিকিট কিনিলাম। আসবাবপত্র গুলি লইয়া গাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ‘খড়গপুর’ পর্যন্ত আমার পূর্কে দেখা ছিল। বিশেষ নূতন বলিয়া মনে হইল না। মাদ্রাজমেলের মত এ গাড়ীতে যদিও উড়িষ্কা-যাত্রীদিগের ঠেসাঠেসি বা ঠেলাঠেলি হয় না, তবে মারাট্টা, তেলুগু, সাঁওতালী, নাগপুরীর ভিড় যে কম হয় তাহাও নয়। মাদ্রাজ-মেলের আরোহীদিগের কথোপকথন তবু কতকটা বুঝিতে পারা যায়—বন্ধেমেলের আরোহিগণের কথা বিন্দু-বিসর্গ উপলব্ধি করা যায় না। বোবার মত মুখ বুজিয়া, গাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হয়। ইহাদের ভিতর যাহারা একটু ভদ্র-বেশধারী তাহারা তবু ইংরাজিতে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকে। খড়গপুর আসিয়া গাড়ী দক্ষিণ দিকে বাঁকিল। এখান হইতে আর একটি স্বতন্ত্র লাইন

মেদিনীপুর অভিযুখে গিয়াছে। “সাড়দিয়া” “ঝাড়গ্রাম” পার হইবার পর হইতে কেবল সবুজ শাল তরু-শ্রেণীর ভিড় দেখা যাইতে লাগিল। এত নিবিড় শালবৃক্ষের জঙ্গল ইহার পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই। যাহা কখন দেখা থাকে না, তাহা যখন প্রথম দেখা যায়, তখন সে দ্রষ্টব্য যদি সামান্য বা সাধারণ হয় তথাপি কেমন হৃদয়-মন হরণ করে। শালবনের মধ্যে প্রাচীন বৃক্ষ বড় দৃষ্ট হইল না। অনেকগুলির জঙ্গল প্রায় পরিষ্কার করা হইয়াছে। রাশি রাশি বৃক্ষ কাটিয়া কোথাও বড় বড় স্তুপ করিয়া রাখা হইয়াছে। এ অঞ্চল হইতে কাঠ নানা দিকে চালান দেওয়া হয়। কাঠের ব্যবসা করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জন করা যায়।

ঝাড়গ্রামের পর হইতে পথটি বড়ই পর্বতময়। রেলের দুই ধারে কেবল পাহাড়, আর বড় বড় ঘন অরণ্য। গাড়ী ঘাটশিলার নিকটবর্তী হইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সেই প্রদোষের প্রশান্ত-দৃশ্য, আজও যেন সেদিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। গাড়ী উদ্দাম-গতিতে ছুটিয়াছে—পর্বতগুলিও যেন রেশারিশি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে, মাঝে মাঝে পর্বতশ্রেণী দূরে পিছাইয়া পড়িতেছে, আর ঘন-শ্রামল নিবিড়-তরু-শ্রেণী তাহাদের কোলে ভাসিয়া উঠিতেছে—গগনের সীমায় আবীরের রক্তিম আভা—কোথাও সমতল ভূমি ক্রমে ক্রমে উঁচু হইয়াছে, তাহার উপরকার বৃক্ষরাজিও স্তরে স্তরে ছোট হইতে বড় দেখাইতেছে। মনে হয় কোন স্ননিপুন চিত্রকর বা শিল্পী বহু যত্ন-আয়াস অবলম্বনে তাহাদের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। গাড়ীর শব্দে শিখিনীর দল উড়িয়া তরুশাখায় বসিতেছে—কোথাও দুই একটি স্নস্ত হরিণ-শিশু দলভ্রষ্ট হইয়া চকিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। এই সকল মনোরম দৃশ্যাবলী অব-

লোকন করিতে করিতে সুবর্ণরেখা অতিক্রম করিয়া ‘সিনি’র কাছাকাছি হইলাম ।

গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া, পথে, প্রান্তরে সন্ধ্যার আহ্বান অনুভব করিলাম । সমস্ত প্রকৃতি সন্ধ্যাসতীকে সাদরে বরণ করিল । শঙ্খ ঘণ্টা কিছুই বাজিল না—কুল-বধূ প্রদীপ দেখাইল না, তবুও সরলশান্ত ছনহীন নিস্তরতার মধ্যে সন্ধ্যা আসিয়া ধরা দিল ।

সিনিতে পৌঁছিয়া শুনিলাম আমাকে পুরুলিয়ার জন্ত এখানে গাড়ী বদল করিতে হইবে । ‘সিনি’ ষ্টেশনটি দিগন্তব্যাপী, প্রান্তরের মধ্যে । একজন তেলুগু ষ্টেশনমাষ্টার, একজন ‘তার’ ও টিকিটবাবু আছে, মনে হইল ইঁহারাই এখানকার সর্বস্ব ! কোনও প্রকার অপেক্ষা করিবার মত স্বতন্ত্র ঘর নাই ।

প্লাটফর্মের উপর দুইখানি বেঞ্চ, তা ছাড়া আর বড় কিছু দেখিলাম না । জানিলাম পুরুলিয়ার গাড়ী রাত্রি বারটার সময় আসিবে । ততক্ষণ আমাকে এই মুক্ত প্লাটফর্মে অপেক্ষা করিতে হইবে । রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত এই ভয়-সঙ্কুল স্থানে অপেক্ষা করিতে সাহসে কুলাইল না ।

ষ্টেশনমাষ্টারকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত একরূপ স্থানে অপেক্ষা করাও বিপদজনক বিবেচনা করিয়া তিনি চক্রধরপুর পর্য্যন্ত একখানি টিকিট দিলেন । বলিলেন—“ওখান হইতে রাত্রি সাড়ে আটটা বা নয়টার সময় পুরুলিয়ার গাড়ী ছাড়ে !” ধন্যবাদ দিয়া, টিকিট খানি হাতে লইয়া ছুটিয়া গিয়া সেই গাড়ীতেই পুনরায় উঠিলাম ।

গাড়ীতে এই সময় একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল । তিনি রায়পুরের অন্তর্গত কোন একস্থানের জমিদার । লোকটির

ললাটে রক্তচন্দনের তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে রক্তবর্ণ চেলী। তাঁহাকে দেখিলে বেশ ভক্তি হয়—আলাপ করিতে আপন হইতে ইচ্ছা হয়।

তিনি কথায় কথায় নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে ছিলেন। ধার্মিক বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করিবার জ্ঞাত যে এইরূপ করিতেছিলেন, তাহা কিছুতেই বলিতে পারি না। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম তিনি বেশ ভক্ত। তিনি দেখিতে বেশ সুন্দর, তপ্তকাঞ্চনের মত গৌরবর্ণ, মাথার দুই এক গাছি কেশ শুভ্র হইতে সবে মাত্র সুরু করিয়াছে—তাহা যেন গাঢ় কৃষ্ণ-মেঘের মধ্যে দুই একখানি খণ্ড সাদা মেঘ। তিনি বলিলেন “আমার বয়স একান্ন বৎসর, আজ এক বৎসর যাবৎ নানা তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি ; শাস্ত্রে লেখা আছে—পঞ্চাশের পর বনে গমন করাই বিধেয়—কিন্তু আমরা সংসারী জীব তাহা আর পারি কই ? বরং দেখা যায় পঞ্চাশের পর হইতেই সংসারের মায়া অধিক জমাট বাঁধিতে সুরু করে।”

আমি বলিলাম ‘সেকথা ঠিক।’

তিনি উত্তর করিলেন “শুধু ঠিক নয়—বর্ণে বর্ণে সত্য—সংসারের সমস্ত ‘খুঁটিনাটি’ যেন সর্বদিক দিয়াও বার্ক্যাক্যের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। সামান্য তুচ্ছ জিনিসকে, এই সময় বড় করিয়া দেখিবার অবসর বোধ হয় সারা জীবনের মধ্যে আসে।

“আপনি কি করেন ?”

“সামান্য জমিদারী আছে তাহাতেই এক রকম বেশ চলিয়া যায় আমার একটা ছেলে বড় হইয়াছে তাহারই হাতে বিষয়কর্ম ছেড়ে দিয়ে পঞ্চাশের পর বনে না গিয়া তীর্থে তীর্থে ভগবানের নাম করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।”

“কতদিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন ?”

“এক বৎসর, ইচ্ছা আছে আর দুই বৎসর পরে একবার বাড়ী ফিরিব।”

“আপনি দেখচি এমনি করে করেই মায়া কাটাচ্ছেন।”

তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন ।

অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, “আমার মনে মনে একটা সংকল্প আছে কিন্তু তাহা পূর্ণ হইবার কোনো সম্ভাবনা দেখি না ; আমাদের দেশে একটা ছোটখাট বিদ্যালয় স্থাপন করা—সমস্ত ব্যয় তার বহন করিতে প্রস্তুত আছি, যাহাতে লোকগুলি কিছু লেখাপড়া শিখিতে পারে—একজন বাঙালী পাইলেই বেশ সুবিধা হয়।”

আমি বলিলাম, “সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিন।”

“এতদূরে কি কেহ আসিতে স্বীকার পাইবেন ?”

“তা সত্য, কিন্তু চেষ্টা করিতে দোষ কি ?”

আজকাল সংসার ত্যাগ করিয়া একা দেশে দেশে আনন্দিত অন্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে এমন লোক যে আছে ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তারপর তাহার সহিত নানা দেশের গল্প হইতে লাগিল—গাড়ীর এই লোকটির কথা সংসারের নিত্য অভাব অভিযোগের মধ্যেও স্মরণ করিলে একটু তৃপ্তি পাই।

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় চক্রধরপুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অপরিচিত স্থান। কাহারও সহিত জানাশুনা নাই। গাড়ীতেও কোন বাঙালী যাত্রী ছিল না ; এখানে অবতরণ করিলে কাহারও সাক্ষাৎ লাভ অদৃষ্টে ঘটিল না। বেশ যেন একটা অভিনব অভিযান হইয়া পড়িল।

‘সাহেব সুভোদের’ এখানে ‘রাত্রি ভোজ’ সমাপন হয়। তাঁহার

আহারে উপবেশন করিয়া কলের পুতুলের মত নীরবে কাঁটা চামচে নাড়িতে লাগিলেন। তাহার হস্ত ক্ষিপ্ৰ, গতি-শীল, তাহার কাঁটা বা চামচে প্লেটের সংস্পর্শে মৃৎ ঠাং শব্দ তুলিতেছিল। বড় আশ্চর্যের বিষয় কাহারও মুখে কথাটি নাই, সুশীল বালকের মত বাহা পায় তাহাই খায়। খান্সামাগুলিকে ধন্যবাদ দিই—তাহাদের মুখে কথাটি পর্যন্ত নাই। পরিবেশন কার্যে যে তাহারা অপরিসীম দক্ষতা লাভ করিয়াছে তাহার কিছু নাত্র সন্দেহ নাই। আমি একজন মেঠাই-ওয়ালার সন্ধানে ‘কলদস’ হইতে কোন অংশে পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাহারও সাক্ষাৎ মিলিল না।

এই অঞ্চলের লোক গুলির কথাও ছাই বুঝিতে পারি নাই, অনেক কষ্টে এইটুকু বুঝিলাম, বাজার ভিন্ন কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। বাজার, ষ্টেশন হইতে এক মাইল পথ। ষ্টেশনের আলো ধীরে ধীরে নিবাইয়া দিল। রেলকর্মচারীরা একে একে স্ব স্ব বাসায় ফিরিল। ষ্টেশনটি বিজয়া-নিশির মত ক্রমে ক্রমে নীরব হইয়া আসিল। লোকজনের কোলাহল মৃদু হইতে ক্ষীণ, ক্ষীণ হইতে ক্রমে ক্রমে আর শ্রুত হইল না। বড়ই কঁয়াসাদে পড়িলাম, কি করা যায় তাবিতে লাগিলাম।

কণ কণে ঠাণ্ডা হাওয়ায় জমিয়া যাইবার ভয় হইল। এত শীঘ্র শীঘ্র এদিকে যে শীত পড়ে তাহা জ্ঞাত ছিলাম না। কি মুন্সিলেই পড়িলাম। জিনিষপত্র লইয়া এখন যাই কোথায়? আমার পক্ষে পুরুলিয়া ও চক্রধরপুর উভয়ই সমতুল; কারণ কোনোস্থানেই কেহ আমার আগমনকে আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল না। অতএব এ রাত্রিতে পুরুলিয়া গিয়াই বা লাভ কি?

চক্রধরপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মটি দীর্ঘে প্রায় অর্ধ মাইল হইবে।

চারিদিকে প্রকাণ্ড তরুরাজি। রুমগুলি দুই চারি বর্ষের নয়। তাহাদের—অনুমান হয়—বয়স অনেক হইয়াছে। ষ্টেশনটি আধুনিক। যে তরুগুলি সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া প্ল্যাটফর্মে থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, তাহারাই নূতনের বন্ধে পুরাতনের সম্বন্ধকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যথার্থই নূতনের কোলে এই পুরাতন গুলিকে বড় সুন্দর মধুর বোধ হইল। বিছানাপত্র টানিয়া একখানি বেঞ্চের নিকট হাজির করিলাম। মনে হইল, এবারকার যাত্রাটা বড়ই অশুভ! এই সময় পুরুলিয়ার গাড়ী আসিয়া প্ল্যাটফর্মে লাগিল। তাহা একখানি মালগাড়ি বলিলে অত্যুক্ত হয় না। দুইখানি মাত্র তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ী ইহার সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে—তাহাতে আবার সে দিন গাড়িতে মোটেই আলো ছিল না। আমার কেমন পুরুলিয়া যাইতে মন সরিল না। গাড়ী যথাসময়ে ছাড়িয়া দিল। তখন অন্ধকার ও পাহাড় এক হইয়া গিয়াছে।

এই সময় দেখিলাম একটি ভদ্রলোক লণ্ডন হাতে করিয়া প্ল্যাটফর্মের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ষ্টেশনে আসিয়া পার্শেল আপিসের দিকে গেলেন! বোধ হইল তিনি বাঙালী। কিন্তু অন্ধকারে মুখখানি ভাল দৃষ্ট হইল না। ভাবিলাম আজ ইহারই অতিথি হওয়া যাক। তিনি বাহিরে আসিলে, অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি কি রেলের কর্ম করেন?” “না” বলিয়া তিনি লণ্ডন উঠু করিয়া আমার মুখের উপর ধরিতেই আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, “একি বিনোদ নাকি?”—“তুমি এখানে?”

“মেলে এসেছি, কিন্তু তুমি এখানে আছ, তাহো জানি না।”

অনেকে অলোক্যর সুখ-সম্পদ ও শোভা-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেই বুঝি পর্য্যাপ্তপরিমাণে তাহারা এ অঞ্চলে অযাচিত ভাবে জন্মাইয়া থাকে। কোল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা ফুল বড় ভালবাসে। অনেক সময় তাহারা কুসুমের ভূষণ ধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট ফুলের কোন প্রকার জাতি বা গৌরব বিচার নাই, ফুল হইলেই হইল। জবা ফুলের পার্শ্বে গোলাপ সমান আসনে সমান আসদর পাইয়া থাকে।

সেদিন আমি একটি নদীর ধার পর্য্যন্ত বেড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম। তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে—পাহাড়গুলির অঙ্গে ধোয়ার মত ছায়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় পাহাড়ের কোন অংশের বৃক্ষ-লতাাদি বেশ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, আর কোন অংশ ছায়া-সমচ্ছন্ন হইয়াও বেশ সুন্দর দেখায়।

বিনোদ আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল,—“চল নদীতে স্নান করে আসি, তা হ’লে তোমার নদী দেখাও হবে।”

আমি বলিলাম “নদী পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছি; কাল তখন আবার যাওয়া যাবে।”

মধ্যাহ্নে কোনো দিনই আমি শয়ন করি না। তত রৌদ্রেও কোথাও বাহির হইতে পারিলাম না। বৈকালে বেড়াইতে যাওয়ার বন্দোবস্ত স্থির হইল। আমি গালা প্রস্তুত দেখিতে কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এক প্রকার ‘গাছের আঁটা’র সহিত অত্যন্ত কতকগুলি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে এই ‘আঁটাগুলিকে একটি প্রকাণ্ড টবে ভিজাইয়া রাখা হয়। তার পর সেগুলিকে খুব পরিষ্কার করিয়া ধৌত করা হইলে, তাহা হইতে কাঠি কুটী ও কাঁকর বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর

মির্জাপুর নিবাসী কারিকরগণ গালার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী
অনুযায়ী মশলা মিশাইয়া গালা তৈয়ার করিয়া থাকে। গালা উত্তম
শ্রেণীর কি মধ্যম শ্রেণীর হইবে তাহা এই ‘আটা’র প্রকৃতি দেখিয়াই
কারিকরগণ নিরূপণ করিতে পারে। আটা জন্মল হইতে সংগ্রহ
করিয়া আনিতে হয়। ৪০ টাকা হইতে ৭০ টাকা পর্য্যন্ত মণ
দলের আটা বিক্রয় হইয়া থাকে। কারিকরগণও খুব পুষ্ট বেতন
পাইয়া থাকে। এই সকল গালা জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানী
হয়। গুনিলাম এই ব্যবসায়ে অত্যন্ত লাভ। গালা প্রস্তুত-প্রণালী
দেখিতে বড়ই চিত্তাকর্ষক। বেলা চারিটার সময় সকলের ছুটি হইয়া
গেল। একজন বৃদ্ধা আসিয়া একটী যুবককে বলিল, “দেলা জুমে
মাড়ি জুমতানা।” সে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সহিত প্রস্থান করিল।
যাইবার সময় নত-নয়নে অনুমতি ভিক্ষা করিল। আমি অপর
একজন সর্দারকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“ইহার অর্থ কি?” সে বলিল
“ভাত প্রস্তুত হয়েচে আহার করবে এস।” তাহাদের কথোপকথন
শুনিতে বড় ভালও লাগে। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল।
একজন ভৃত্য লণ্ঠন হাতে করিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এখানকার বাজার খুব ছোট। দেখিবার মত কিছুই নাই।
খান কয়েক ঘরে ব্যবসায়ী হিন্দুস্থানীদের দোকান। তাহারা যে
কোন স্থানে নাই তাহা বলিতে পারি না! বাজারে দুইখানি খাবারের
দোকান। তাহাও হিন্দুস্থানীদিগের; তবে দোকানের শ্রী নাই।
খাবার গুলির উপর একটা পুরু ধুলির স্তর পড়িয়াছে।

একখানি বিশ হাত লম্বা চালা—তাহাতেই বাজার বসে।
যাহারা বাজারে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে আনে তাহাদের মধ্যে
অধিকাংশই স্ত্রীলোক। কাকরোলই দেখিলাম তরি-তরকারীর উচ্চ

সিংহাসন খানি অধিকার করিয়া একাধিপত্য করিতেছে এবং একমাত্র অনায়াসলভ্য। চক্রধরপুরে গালা, চাল, সরিষা, রেশম, কাষ্ঠ, চর্ম প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এ অঞ্চলের পাহাড় ও জঙ্গলগুলি গভর্ণমেন্টের 'খাসমহল।' কমিশনারের বিনামূল্যে ক্রয় এই সকল পাহাড়জঙ্গলে শিকার করিতে পারে না। শুনিলাম এই সকল পর্বত-প্রদেশে শিকার অভিযান করিতে গিয়া অনেক ইংরাজ কর্মচারী অকালে প্রাণ হারাইয়াছেন।

চক্রধরপুরে দুই চারিজন বাঙালী ব্যতীত আর বাঙালী নাই! স্থানটির জল বায়ু অত্যন্ত সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। লোকে অনায়াসে এই স্থানটিকে বায়ু পরিবর্তনের জন্ত নির্দেশ করিতে পারেন! বোধ হয় এই স্থানটি অধুনা জনকোলাহলপূর্ণ মধুপুর প্রভৃতি অঞ্চল অপেক্ষা খুবই ভাল।

বাজার দেখিবার পর আমরা রাজ-বাটী দেখিবার নিমিত্ত চলিলাম। বাজারের সম্মুখের পথ দিয়াই রাজ-বাড়ী যাইতে হয়। অল্পদূর আসিয়া দেখিলাম একটি অল্পপরিসর নদী; তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র সেতু—সেতুটি বাঁশের নির্মিত। সেতুর পরপারেই রাজপ্রাসাদ! এই স্থানটি 'কেরাই' নামে অভিহিত। এখানকার লোকে চক্রধরপুরের রাজাকে 'কেরাইরাজ' বলিয়া থাকে।

রাজ-প্রাসাদ দেখিবার নিমিত্ত যে আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল দূর হইতে রাজ-বাড়ী অবলোকন করিয়া তাহা নিরন্তর হইয়া গেল! গগনস্পর্শী সৌধ-চূড়া নাই, ক্রোশ-ব্যাপী গড়ও নাই, রাজ-প্রাসাদোপযোগী নহবৎখানা নাই, দ্বারে বন্দুক স্বন্ধে প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত নাই, রাজৈশ্বর্যের কোন লক্ষণ সেখানে পরিলক্ষিত হয় না।

কেহ ইহাকে রাজ-বাড়ী বলিয়া নির্দেশ না করিয়া দিলে ইহার নিজের এমন কোনো আকর্ষণ নাই যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। ইহা সামান্য একখানি গৃহস্থের বাড়ীর ছায়। কোনো প্রকার বিশেষত্ব বা জাঁকজমক নাই।

শুনিলাম কিছু দিন পূর্বে এই রাজ্যের মধ্যে একটা সোনার খনি বাহির হইয়াছিল এবং রাজাকে অবলম্বন করিয়া একটা যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কত লোক ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় সেই কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিয়া অবশেষে রাংও পায় নাই। অদৃষ্টকে কঁাকি দিয়া বাঁহারা শীঘ্র বড়লোক হইবার অভিপ্রায়ে প্রথমে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা পরে চক্রধরপুরের উপর নিশ্চয়ই অভিসম্পাত করিতে কুষ্ঠিত হন নাই।

বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় রাস্তার দুই একটা চক্চকে পাথর কুড়াইলাম। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল “ও গুলো আবার কি হবে ?।”

আমি বলিলাম—“যদি সোনার খনির দেশে দুই একটা হীরা মাণিক পে'য়ে যাই তো আর দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে না।”

বিনোদ বলিল “পকেটে রাখছ ভাল করচ না ; অতি লোভে শেষে সুপারি মনে করে দাঁত ভেঙে না।”

পরদিন চাঁইবাসা বাইবার পথে বেড়াইতে চলিলাম। সে দিন আমি একাই বাহির হইলাম। এই পথে প্রায় দুই মাইল অগ্রসর হইতেই একটা লৌহনির্মিত সেতু দেখিতে পাইলাম। এই সেতুটি পর্বতের বন্ধের উপর। ইহার উপর দিয়া গাড়ী, বোড়া, পুষপুষ প্রভৃতি যাতায়াত করে।

এই স্থানটি অতি নির্জন ও মনোরম। দুই দিকে উচ্চ পাহাড়। হাড়ের বন্ধ ভেদ করিয়া এই পথ চাঁইবাসা অভিমুখে গিয়াছে।

একটি নিৰ্ব্বাৰ এইখানে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়াছে—সে দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার মনেসে নিভৃত নির্জন পৰ্ব্বত-গুহা হইতে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্মুখেই প্রকাণ্ড পাহাড় তাহার গতিরোধ করিয়াছে, সুতরাং সে এখানে অত্যন্ত মুখর হইয়াছে । কি বিপুল জলোচ্ছ্বাস ! কি গভীর আৰ্ত্তনাদ ! নিৰ্ব্বাৰ যেন স্থির সংকল্প করিয়াছে—পৰ্ব্বত-কায়া ভাঙ্গিয়া আজ গন্তব্য-পথে যাইবেই যাইবে । ভাবিলাম নির্জনের লোক বাহিরে আসিলে কি এমনি গোল করিতে হয় ? চির অন্ধকার-কারায় অবস্থান করিয়া আলোকের সংস্পর্শে আসিলে কি এমনি উদ্ভ্রান্ত হইতে হয় ? বন্দী মুক্তি পাইলে কি এমনি উতলা ও উদ্দাম হইতে হয় ?

পাহাড়ের বক্ষের উপর কখনও এমন অবস্থায় নিৰ্ব্বাৰিণীর সাক্ষাৎ পাই নাই । তাই আজ এই ক্ষুদ্র নিৰ্ব্বাৰিণী নিরীক্ষণ করিয়া—হৃদয় পুলক-আনন্দে নাচিয়া উঠিল ! কত কথাই মনে আসিতেছিল । দক্ষিণের পাহাড় হইতে সে এখানে নামিয়াছে, কিন্তু কিছু দূর আসিয়াই সে দেখিয়াছে সম্মুখে বিশাল পৰ্ব্বত ।

“পথ নাই, পথ নাই” বলিয়া পৰ্ব্বত যেন গিরি নিৰ্ব্বাৰিণীকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বার বার অনুরোধ করিতেছে ! কিন্তু সে, এই কথায় কর্ণপাত করিতেছে না । তাহার প্রতিশব্দে যেন ধ্বনিত হইতেছিল ।

“ভাঙ্গরে হৃদয় ভাঙ্গরে বাঁধন,

সাধরে আঁজিকে প্রাণের সাধন,

লহরীর পথে লহরী তুলিয়া

আঘাতের পরে আঘাত করু !

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
 কিসের আঁধার কিসের পান্থাণ,
 উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
 জগতে তখন কিসের ডর !”

এই সময় দেখি, আমাদের বাসার সর্দার ইন্দ্র একটা ছাগশিশু কোলে লইয়া সেই পথে আসিতেছে, সে যেন আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ইন্দ্রের সম্বন্ধে এখানে হুই একটি কথার উল্লেখ না করিলে একটি পবিত্র প্রণয়-কাহিনী পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে।

আমাদের কারখানায় কামিনী কাজ করে; কামিনীকে ইন্দ্র ভাল বাসে; বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু কামিনী তাহাকে এমন ভাব দেখায় যে, সে তাহাকে মোটেই দেখিতে পারে না—সে তাহাকে চায় না; তার কথা শুনিলে জ্বলিয়া উঠে—ছায়া দেখিলে লাফাইয়া সরিয়া যায়। ইন্দ্র এই সকল জানিয়া আরও তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। বিনোদ ইন্দ্রকে বুঝাইয়াছে যে,—“তুই এই নূতন বাবুকে পাকুড়া, তা হ’লেই তোর বাসনা পূর্ণ হবে।” তাই নাকি সে আমার পূজার জুতা পাঁচটা সংগ্রহ করিয়াছে! আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বাসায় ফিরিলাম। তাহার জুতা সত্যসত্যই প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল। কারণ লোকটা বড় ধর্ম্মভীরু ভাল মানুষ। বাসায় বসিয়া বিনোদকে বলিলাম,—“এ আবার কি হয়েছে?” বিনোদ হাসিয়া বলিল, “ও লোকটা বিয়েপাগলা হয়ে গেছে। কামিনীকে বিবাহ করিবার জুতা ওকে যা-কিছু করতে বলবে, ও দ্বিধা না করে তাই করবে। এমন ধারা তো বাবা গরীব লোকের ভিতর কখনো দেখি নেই।”

আমি হাসিয়া বলিলাম “প্রণয়ের রীতি সর্ব্বত্রই এক রকম। বড়

লোকের বা তদ্র লোকের জ্ঞাত রতি-পতিকে স্বতন্ত্র বা নূতন শর যোজনা করিতে হয় না, সে একই শর, একই সন্ধান, একই প্রয়োগ !”

কামিনীকে সে দিন বৈকালে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত আমার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে আমি বলিলাম “তুমি ইন্দ্রকে এখানে ডেকে আনো।”

সে মৃত্তিকার প্রতি নতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, নড়িল না।

আমি মনে মনে সকলই বুঝিলাম, পুনরায় বলিলাম, “ইন্দ্রকে ডেকে আনো।” এবার সে ছল ছল নেত্রে উত্তর করিল, “তাহার সহিত কথা বলবো না।”

“কেন ?”

তাহার গণ্ডস্থল লাল হইয়া উঠিল। “সে বলিল,—সে কেন আমায় বিয়ে করতে চায় ?”

“বিবাহে কি তোমার মত নাই ?”

“আমার বাবাকে না বলে’ কেন আমাকে বলে ?—আমি তো বলেছি বাবাকে বলতে।”

এই সুন্দর নীতি-বন্ধনটি অশিক্ষিত জাতির মধ্যে বড়ই মধুর ও প্রাণস্পর্শী বলিয়া মনে হইল।

ইহাদের বিবাহ প্রায় রথের দিনেই প্রশস্ত। বিবাহের অনুষ্ঠানটি দেখিতে বড়ই সুন্দর, অভিভাবকবর্গ ছুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বিবাহার্থী কণ্ঠাগণ পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। সে দিন তাহারা বিশেষ করিয়া ফুল-সাজে সজ্জিত হয়। সর্ব্বাঙ্গে ফুল পরে, কর্ণে ছল ছলাইয়া দেয়। বিবাহার্থী পুরুষগণ তাঁর ধনুক লইয়া যাত্রার দলের রাম লক্ষ্মণের মত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই সকল কুমারীদিগের প্রতি অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া

ধাকে ও তাহাদের নৃত্যভঙ্গীর প্রশংসা করে। যে কণ্ঠাটি যাহার মনো-
নীত হয়, ছুটিয়া গিয়া নৃত্যাবস্থা হইতে সে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া
লইয়া আসে। এই স্বৈচ্ছা গ্রহণে কুমারীরা বা তাহাদের অভিভাবকবর্গ
কোন প্রকার আপত্তি করে না। সঙ্গিনীদের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া
কণ্ঠা তখন তাহার সহিত চলিয়া আসে ; নৃত্য কিন্তু বন্ধ যায় না,
সমানে চলিতে থাকে। এই সময়ে বাজনা বাজিয়া উঠে। কণ্ঠার
মাতা পিতা, বরের মাতা পিতার নিকট তখন ছাগল কাপড় কড়ি দিয়া
কণ্ঠাকে গৃহে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিতে থাকে। তাহাদের দল
তখন এই বিবাহ-প্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করে। ইহার পর সাহেবদের
“মধু চন্দ্রের” মত নব দম্পতী গৃহে অবস্থান না করিয়া কিছুদিন
আনন্দে পাহাড়ে জঙ্গলে অতিবাহিত করিয়া আসে।

কামিনীর পিতাকে ডাকাইয়া ইন্দের সহিত তাহার কণ্ঠার বিবাহ-
প্রস্তাব করিলাম। সে আমাদের এই ব্যাপারে আগ্রহ অবলোকন
করিয়া আনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করিল।

যে দিন কামিনীর সহিত ইন্দের পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। তাহার
পর দিন আমি বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী
ফিরিলাম। কিন্তু চক্রধরপুরের সেই মিলন মাধুর্য্য কখনো ভুলিতে
পারিব না। ইন্দ্র ও কামিনী আমার জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলিয়া
দিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িবার সময় তাহারা আধুনিক সভ্যতানুযায়ী
কোন প্রকার সৌজন্ত প্রকাশ করিতে অনভিজ্ঞ হইলেও এমন কয়েকটি
আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাব তাহাদের অঙ্গ-ভঙ্গীতে ছুটিয়া উঠিয়াছিল
যাহা এ জীবনে আর কখনও দেখিব বলিয়া মনে হয় না।

गुरुकुल कांगड़ी
आर्य समाज



गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार

पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अङ्कित
है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै
नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का
लौटाने लगेगा।

पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार ।

